নিতির জন্য দুঃখে ও সুখে

Moti Nandy

NIRBACHITA GALPA

Edited by : *Santosh Kumar Ghosh*

Rs. 12·00

Rs. 15·00 (deluxe) :

ভূমিকা

১. মতি নন্দীর গল্পের ভূমিকা—লিখব আমি? অসম্ভব, সে হয়না। এমন ঘটনা কেউ কখনও দেখেছেন নাকি যে, দেওয়ালে ঝোলানো সাবেকী একটা ফটো ঝুঁকে পড়ে পড়ে ঘরের মানুষদের, চলছে ফিরছে যারা তাদের, চিনিয়ে দিচ্ছে? মতি জ্যান্ত, এবং কিকিং—বাংলা কী?—এদিক ওদিক দমাদ্দম লাথি ছুঁড়ছে। গনগনে উনুনটাকে টর্চের আলো ফেলে দেখিয়ে দেওয়ার বোকামি করতে সাধ যাচ্ছে না।

মতি নন্দীর গল্প কেমন; আর কী? যদি জানতে চান, পাঠক! তবে পাতা উলটে যান, সেটা বলে দিতে গল্পগুলোই তো আছে। পরের মুখে ঝাল খাওয়ার অর্থ নাস্তি। আমি বরং অনেক দিন আগে একবার হঠাৎ মুখে ঝাল লেগে কেমন চমকে উঠি, সেই গল্পটা বলি। তখন কলকাতা থেকে অনেক দূরে থাকি। একবার 'দেশ' পত্রিকার একটা লেখা পড়ামাত্র অস্থির হয়ে যাই, জিভে, চোখে, বুকেও; সেই অস্থিরতাকেই ঝাল বলেছি। সেই অস্থিরতার আর এক নাম হয়তো ঈর্ষাও।

গল্পটা একটা গলির। একটি উঠতি বয়সের মেয়েকে ঘিরে ঘুরছে; কিংবা, বলা যায়, মেয়েটাই ঘুরছে পাড়াটার বাড়ি বাড়ি। ছোট মেয়ে, সব দিক থেকেই সে খুব ছোট। এই পর্যন্ত মনে আছে। আর মনে আছে আমার ভিতরে যেটা কাঁটার মতো ফুটছিল, সেই কথাটা: আরে, মেয়েটাকে আমিও তো চিনি, অন্তত চিনতাম এককালে। কিন্তু তার কথা এভাবে তো লিখতে পারিনি?

এর পরে, কিঞ্চিৎ সময়ের ব্যবধানে, তার আরও কয়েকটা গল্প পর পর পড়ে ফেলি। 'পরিচয়' ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকায়। লেখকের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ও হয়। আসলে আমিই তাকে ধরে ফেলি, সে নয়। মতির স্বভাবে ধরাধরি বস্তুটা বস্তুতই নেই। বয়সের তুলনায় একটু বয়স্ক সে, একটু গোঁয়ার। যে মেজাজটা মেলে তার লেখাতেও! লেখার সঙ্গে লেখক এদেশে প্রায়ই মেলে না, মতি অন্যতম ব্যতিক্রম। শিবের গীত গাইছি না, ধানই ভানছি।

মানুষটা কেমন জানা হয়ে গেলে তার লেখাটেখা বোঝাও সহজ হয়। মতি নন্দীর লেখা পড়াটাই যেমন একটা আবিষ্কার, তেমনই আবিষ্কার মানুষটাও। স্যাঁতসেতে ব্যাপার একদম নেই, সর্বদাই খটখট করছে।

২. এতক্ষণে নিশ্চয়ই বোঝা গেছে যে, ভূমিকা এটা আদৌ হচ্ছে না, একজন গল্পলেখককে নিয়ে লিখতে বসেছি একটা গল্প। "বিশ্বসাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান বঙ্গ সাহিত্যের। সে সাহিত্যে আবার ছোট গল্পের স্থান বিশিষ্ট। রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় হইতে তারাশঙ্কর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নরেন্দ্র মিত্র—ছোট গল্পের ধারাটি বাঁকের পর বাঁক অতিক্রম করিয়া বহিয়াই চলিয়াছে, কল্লোলোত্তর কাল অধুনা মতি নন্দী প্রভৃতি নবীন নামগুলি কেন্দ্র করিয়া কল্লোলিত"—এইভাবে আরম্ভ করলে বেশ গ্রাম্ভারী, প্রামাণিক জাতের ভূমিকা হত। কিন্তু সেসব আমার আসে না। দ্বিতীয়ত কথাগুলো মিথ্যেও হত। খুব বেশি ছোট গল্প কি লেখা হচ্ছে আজকাল? এখনকার বাজারে বেশির ভাগ যা বেরোচ্ছে তা না ছোট গল্প, না উপন্যাস, মাঝারি সাইজের বড় গল্প। ব্যাঙের মতো পেট ফুলিয়ে যা নিজেকে উপন্যাস বলে জাহির করে, তারই ফরমাস বায়না কদর। যেমন ডিমান্ড্ তেমনই সাপ্লাই চলছে, ছোটগল্প লিখতে উৎসাহ বোধ করেন ক'জন? একেবারে ঋতু শেষ তার, এই সেদিনও যে ছিল ছোট্ট মেয়েটি। নখাগ্রে মুখের বিম্ব, গালের টোলটি—আমাদের সাহিত্য থেকে এ-সব জিনিস উবে যাচ্ছে।

এ-ও তাজ্জব ব্যাপার—অতীব লজ্জারও—মতি নন্দীদের গল্প-সংকলন বের হচ্ছে এত দিনে, যখন তার মুদ্রিত গল্পের সংখ্যা কম-সে-কম ত্রিশ-চল্লিশ, তাও মোটে গোনা-গুন্তি বারো-তেরোটা গল্প নিয়ে! আইবুড়ো নাম এত দিনে ঘুচল। আমাদের কালে, ভালো ঘর-বর না জুটুক, অন্তত বিয়েটা হয়ে যেত। এই সিরিজ-এর প্রকাশকের প্রতি: ঝুঁকি নিলেনই যদি, তবে অন্যদের দিকেও চেয়ে দেখুন। মতি, শীর্ষেন্দু, সুনীল আর শ্যামল, এরা মিলে যদিও এ-কালের লেখার অনেকখানি, তবু সবখানি নয়। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, এদের একটা দুটো সংকলন তবু আছে, কিন্তু দিব্যেন্দু পালিত, সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায় এবং কবিতা সিংহের অনেক গল্প এখনও সংকলিত হওয়ার অপেক্ষায়।

৩. আপাতত যেখানে শুরু করেছিলাম, সেখানেই ফিরে যাই—মতি নন্দীর গল্পে। যে-কোন পাঠক কিছুটা পড়লেই বুঝতে পারেন, তার গল্প বস্তু বাদ দিয়ে নয়—বস্তুবাদী। তার মানে কি এই, যে 'ফিক্‌সনাল ক্রাইসিস্‌' অধুনা সর্বব্যাপী, গত শতকে ভূমিষ্ঠ কাফ্‌কা, জর্জ লুই বোরজেস্‌ ইত্যাদির মধ্যেও যার ইঙ্গিত মেলে। কোরটাজার, নাবোকভ প্রভৃতি পরবর্তীরা তো আছেনই—সেই মহামারী থেকে মুক্ত সে বর্তমান বহাল তবিয়তে? লক্ষ্য করে দেখা যায়, এখনও তার বেশির ভাগ গল্পই 'থার্ড পারসন'-এ, সেই আবহমান রীতি—সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী লেখকেরই জবানী। 'থিওরি অব ইনডিটারমিনেসি'-র আভাস মাত্র তার মধ্যে দেখি না, কোথায় "সাইকেডেলিক" অভিজ্ঞতার ব্যবহার, যা সভ্য মারিহুয়ানার প্রসাদে, ঝাপসা আয়না মনের! প্রতীকী অর্থের প্রয়োজনে ভাষার কাঠামোটাকেও আগাগোড়া ভেঙে-চুরে দিয়ে সব প্রচলিত রীতির বহিষ্কার? মনে হয়, হাল আমলের রাস্তার ধারের সস্তা দোকানে মতি নন্দী সওদা করেনি। অস্তিবাদী মহাবিশ্বে মহাকাশে নিঃসহায় নিঃসঙ্গ মানুষদের টেনে নামানোর জন্যে লম্ফঝম্ফ তার মোটে দেখি না, কেন না সে দিব্যি দণ্ডায়মান তাঁর নিজের শুকনো ডাঙায়, রূঢ় মাটিতে। সেইখানে দাঁড়িয়ে সে একে চড় মারছে, ও-কে চাপড়, কাপড় চোপড়ও খুলে নিচ্ছে কারও কারও, একে খোঁচা, ওকে গাঁট্টা মারছে। মারছে তাদের, যারা রক্তাল্প মানুষ নয়, বরং রক্তাক্ত, যারা বাস করে পাড়ায়, পরিবারে; মেটারনিটি ওয়ার্ড থেকে "ট্যাকসি" করে বাড়ি যেতে চায়, কট করে বিস্কুট কামড়ে "খুকির মতন হাসে" (রাস্তা)। যারা অফিসের পিওন লটারিতে টাকা পেলে উত্তেজিত বোধ করে, ক্লান্তিও, যে ক্লান্তি' "ক্রমশ তাকে দীনতার মধ্যে ডোবায়।" এবং পরে "কামনার দ্বারা প্রবলভাবে আক্রান্ত হয়" (জীবনযাপন প্রণালী)। যারা ধর্মতলার মোড়ে ব্যস্ত হয়ে নামা লোকটার তালগোল পাকানো মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী করে অহেতুক, পরে, তেমনই অহেতুক, নিজেকে কুরুক্ষেত্রে সব্যসাচীর মতো নিমিত্তমাত্র ভেবে একেবারে হালকা হয়ে যায় (পাষাণভার)। এরই মধ্যে একটু দূরে গিয়ে পিকনিক সেরে আসে কারা, ফেরার সময় সারা পথ সেই মেয়েদের পায়ের কাছে শাড়িঢাকা শব শোয়ানো—অসফল এক তরুণের। গ্রাম্য স্ত্রীকে শহর দেখাতে এনে ভারিক্কী স্বামী "বিদেশীকে নিজের সাম্রাজ্য দেখাবার ভঙ্গিতে" বলে "বিশতলা···আমি একবার উপরতলায়

উঠেছিলুম।" আর পকেটের সব পয়সা—ফেরার ট্রেন ভাড়াও—চায়ের দোকানের বেয়ারাকে দিয়ে, সেলাম কিনে, যখন হেঁটে হেঁটে ফিরে যায়, তখন তার বউ বলে "যখন সেলাম করল, তোমাকে দারোগাবাবুর মতো লাগছিল।" (শহরে আসা)।

"বয়সোচিত" গল্পটিতে বয়স যে যায়নি, সেটা প্রমাণ করতে একটি মানুষকে অফিসের স্পোর্টস-এ হাঁটার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়তে দেখি; নইলে, তার ভয়, সে রিটায়ার হয়ে যাবে। বিস্ময় সেখানে নয়। বিস্ময় এইখানে, সেই মানুষই পরদিন অফিস থেকে ফিরে বউকে বলে "আর রিটায়ার করাতে পারবে না।" কেন?—"রিজাইন দিয়ে এলুম।" বাতিল-নম্বর এক ফুটবলারে মৃত্যুই তার "প্রত্যাবর্তন"। তার শেষ কয়দিনে তার ব্যক্তিগত সমস্যা ছিল একটা ন্যাড়া নিমগাছ।—"গাছ তো তার পাতার মধ্য দিয়ে যা শুষে নেয়, তাই দিয়েই···বেঁচে থাকে। পাতাই নেই' তা-হলেও বেঁচে আছে কী করে?" (এই গল্পেরও পশ্চাৎপট স্পোর্টস, বলা যায়, মতিই প্রথম বাংলা গল্পে স্পোর্টকে যথার্থ সাহিত্যের বিষয় করেছে।)

৪. এই সব গল্প, এইসব মানুষের। পুরো ফর্দ দেব না, গোড়ায় বলেই তো নিয়েছি, রানিং কমেনটারি আমার কর্ম নয়। বায়বীয় নয়, এই মানুষেরা বাস্তব, মাংস-মজ্জা-চামড়ার। ভৌতিক নয়, ছায়া পড়ে, তাদের ফটো তোলা যায়। মতি তাদের দেখেছে। দেখাটাই অবশ্য সব কথা নয়, ভাখে তো সকলেই। দেখাটাকে সে লেখাও করেছে। তার আদ্যোপান্ত দেখা জগৎকে। তার দৃষ্ট জগৎ, সৃষ্ট জগৎ নয়। এখানে তার সরাসরি আত্মীয়তা কোন্ পূর্ব-সূরীর সঙ্গে?—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পারিবারিক চেহারার মিলটা সহজেই চেনা যায়।

মতিরও বড় শক্তি, তার অভিজ্ঞতা। মাল মশলা যার আছে, তাকে ফুঁ দিয়ে কিছু তৈরী করতে হয় না। এদেশে সেকালের লোকে যেমন চেঁচিয়ে 'গোমাংস ভক্ষণ করেছি' বলে মুখে পুরত, সে ডিক্লেয়ার করে তেমন আশাস্ত্রীয় কিছু করে না। গল্পের শুরু আছে, মধ্য আছে এবং শেষ আছে, সে মানে। মাঝখানটাকে শেষে টেনে এনে শুরুকে ঢুকিয়ে দিয়ে মাঝখানে, লাগ-ভেলকি? সে লাগায় না। তার ন্যারেটিভ। নারী শরীরের বর্ণনা যেমন ধ্রুপদী ও

সমুচিত, তেমনিই : মাথা থেকে ক্রমে নেমে পায়ের পাতা অবধি। গোড়ালি থেকে আরম্ভ করলে মুখে এসে মেয়েরা ফুরিয়ে যায়। আর প্রকরণ শাস্ত্রীয় অশাস্ত্রীয় যেমনই হোক না, হোক 'অ্যানটি'-সব কিছু, তবু নঙর্থক বস্তু, বোধ বা বিষয়ও তো কিছু থাকবে? বোধ, না থাকলেও প্রশ্ন? মতি নন্দীর গল্প এই জীবনবোধ, জ্ঞান ও জিজ্ঞাসায় বিলক্ষণ ভরে আছে। তবু—

তবুটা কী? তবু এই যে, ভরে আছে কিন্তু ভরাট হতে চায় না। যেখানে মতির শক্তি, সেখানেই তার সীমা, তার চরিত্রেরা যেন ভয় পায় গলির বাইরে পা বাড়াতে। অথচ এটা তো ঠিক, প্রায় সব গলিই, শেষ পর্যন্ত গিয়ে দেখা যায় কানা? তাই মুখ ফিরিয়ে ফের তেপান্তরের মাঠে, এমনকি সমুদ্দুরেও যেতে হয়।

এই তত্ত্বটা মতি নন্দী নিশ্চয়ই জানে, নইলে সে একবার "ফেরারী" হত কি? তার "দুঃখের বা সুখের জন্য" কাহিনীটার পাত্র-পাত্রী কেনা জমির চৌহদ্দির চারটে খুঁটি হারিয়ে ফেলত না। হারিয়ে ফেলার যে-মুক্তি তা চকিতে আভাস দিচ্ছে, পরমুহূর্তেই আবার বিমর্ষ ছায়ায় ঢেকে যাচ্ছে।

সাহিত্যের সত্য এই দুটোই। কাঁটা-ছেঁড়ায় নির্মম ছুরি, আর প্রলেপের মলম, দরকার এই দুই-ই। ঝকঝকে ছুরি দেখতে পাচ্ছি মতির হাতে, কিন্তু— এ-কথা লেখার জন্য সে আমাকে যেন মাপ করে— তাকে এখন মলম কিনতে হবে। মানুষের ভ্যানিটি ব্যাগের নাড়িভুঁড়ি সে বের করে এনেছে; চিৎ করে উপুড় করে দেখিয়ে দিয়েছে আত্মপ্রতারণা আছে যত রকম ["ওখানে (কোনারকে) সত্যি দেখবার জিনিস আছে।" "আপনি গেছেন?" "আমার নন্দাই গেছল।"]—এখন আর একটু ভালবাসাও চাই। শুকনো খেজুরের সঙ্গে সঙ্গে আঙুর, একটু টক্‌টক্ হলেও ক্ষতি নেই। আঙুর অবশ্য মিলছে এক আধটা। এক বোন যখন ভাবছে "মানুষের মুখ মরচে ধরা টিনের কৌটোর মতো", তখন অন্য বোন দেখল, "হাসতে হাসতে ট্রেনের মুখ চলে যাচ্ছে"— এ কথা মতি নন্দীই লিখেছে।

লিখেছে, লিখে যেতে হলে তাকে আরও লিখতে হবে। বেলা যত পড়বে, জ্বালাও তত জুড়োবে। ছায়া ঘনাবে জমতে থাকবে মমতা। মলম আপনা থেকেই লেগে যাবে। শেষবেলার একটা গল্প মতি তো ইতিমধ্যেই লিখেছে—

"ছ'টা পঁয়তাল্লিশের ট্রেন।"

ওর (বুড়োর) শরীর থেকে বন্য গন্ধ আসছে।…ঘন ভুরু, দাড়িতে ভরা মুখটা রাস্তার আলোয় বিক্ষত দেখাল।

"জানো, আমি আর কিছু বুঝতে পারি না।…একটা মেয়ে কাল ভাত দিল, খেলুম, স্বাদ পেলুম না।…কাল পেচ্ছাপ করে ফেললুম, তাতেই সারারাত শুয়ে রইলুম। বুঝলে, আমার শীত করল না।"

"ছ'টা পঁয়তাল্লিশের গাড়িতে চলে গেল, আমাকে ফেলে", বুড়ো বলেছিল। তার আগে ট্রেনটা আমার "নিয়তি," বলেছিল, এই লেখাটারই আর-এক চরিত্র—বিনোদ। এই গল্পটা পর্যন্ত পড়ে থেমে গেছি, আর এগোতে পারছি না। শুনছি "ছ'টা পঁয়তাল্লিশের ট্রেন আজ আর আসবে না।" কিন্তু ও-ট্রেন তো আমার নয়। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখছি, এগারোটা বেজে পঞ্চান্ন। কার ট্রেন কখন?

কলকাতা

সন্তোষকুমার ঘোষ

সূচীপত্র

॥ রাস্তা ॥

"দীপু, তোর বাবা এখনো আসছেনা যেরে। একবার গেটের কাছে গিয়ে দ্যাখনা।"

মেটারনিটি ওয়ার্ডের গাড়ি বারান্দার তলায় তখন একটাই মোটর দাঁড়িয়েছিল। দীপু তার বাম্পারে বসে দেখছিল, উত্তর-পূব কোণার লালবাড়িটার সিঁড়িতে তুটো ছেলেমেয়ে কথা বলছে। তুজনের হাতেই বুক দেখবার নল। মেয়েটা হেসেই কুটিকুটি। হাসি থামিয়ে সিঁড়িতে উঠছিল। আবার কি শুনে আবার কুটিকুটি। মেয়েটা আটকা পড়ে গেছে। দীপু ভাবল, ছেলেটা কি খুব হাসির গল্প জানে, নাকি এখনো খিদে পায়নি মেয়েটার!

"অ দীপু—"

"বলেছি তো, অফিস থেকে ছুটি করিয়ে তবে আসবে।"

"তোকে একলা পাঠাল কি বলে শুনি? ছেলেমেয়েগুলো বাড়িতে এতক্ষণ কি কাণ্ড করছে কে জানে।"

"শিকলি দিয়ে এসেছি।"

"তাতে কি হয়েছে, ঘরের জিনিস ভাঙবে। এত বেলা হল ওদের খিদেও তো পেয়েছে।"

মেয়েটা লালবাড়িতে ঢুকে গেল। সোজা পূবমুখো রাস্তা ধরে ছেলেটা চলে যাচ্ছে। হাতের নলটা দোলাচ্ছে। দীপু পূবদিকে তাকিয়ে রইল।

কমলা দেখছে সবুজ শাড়িপরাটিকে। গাড়িবারান্দার নিচে আরো তিনটি বৌ বসে। সবাই মাঝ-বয়সী। শুধু একে দেখেই মনে হচ্ছে প্রথম পোয়াতি। চোখে-মুখে ভয় এখনো কাটেনি। বাচ্চাটাকে পর্যন্ত ভরসা ক'রে কোলে নেয়নি। নাতি কিংবা নাতনিকে কোলে নিয়ে দোলাচ্ছে বুড়িটা।

ঘস্ করে ট্যাক্সিটা থামল। তর সইছে না ছেলেটার। নেমেই তাড়া দিল ওঠার জন্য। হাসপাতালের বুড়ো দারোয়ান ট্যাক্সির দরজা খুলে ধরেছে। বৌকে দু'হাতে ধরে তুলল। দু'পাশে তাকিয়ে বৌটা স্বামীর হাতদুটো সরিয়ে দিল।

বুড়ি ট্যাক্সিতে উঠতে পারছে না। হাতজোড়া বাচ্চা। মাথা নিচু করে ঝুঁকলে, খাড়া থাকার মত জোর আর কোমরে নেই।

"আপনি ছেলেকে ধরুন না। উনি উঠলে পর কোলে দেবেন।"

কমলার পরামর্শ শুনল ছেলেটা। দরজা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল দারোয়ান। একটা টাকা বখশিস পেল।

"জানলি দীপু, তোকে নিয়ে ওঠবার সময় ট্যাস্কির দরজায় মাথা ঠুকে গেছল! খিঁচিয়ে উঠেছিল তোর বাবা। এমন রাগ ধরেছিল তখন, মনে হয়েছিল দিই তোকে ফেলে, যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাই।"

"বাবার স্বভাবটা বড় বিচ্ছিরি।"

"তোর ঠাক্‌মা খুব বকেছিল তোর বাবাকে। হ্যাঁরে, মনে আছে ঠাক্‌মাকে? আমায় খুব ভালবাসতো।"

"তুমি ট্যাক্সি ক'রে গেছলে!"

"এর থেকে বড় ছিল ট্যাস্কিটা। তোর মেজমামা, সোনাপিসী সব্বাইকে ধরে গেছল।"

"নিতু, অপু, বাচ্চু ওরাও ট্যাক্সিতে গেছল?"

"শুধু নিতুটা গেছল, আর সব রিসকোয়।"

কমলা তার বাচ্চাকে কোল থেকে ছড়ানো পায়ের উপর শুইয়ে

"জানলায়। ঘণ্টুদের বাড়িতে একটা লোক তখন ভাড়া ছিল, খালি তাকাতো।"

কমলার খেয়াল হল, চটিটা এখনো পরে আছে। খুলে ফেলল।

"থাক্ না।"

"না তুই পর। ওটা পরলে কেমন কেমন লাগে।" পায়ের পাতায় হাত বোলাল কমলা। আঙুলে হাজা, গোড়ালি ফাটা।

"আমার জন্যই এই কষ্ট, নারে?"

"তোমার জন্য কেন হবে।"

দীপু মাথা নামিয়ে পায়ের আঙুলের ফাঁকে আঙুল ঘষতে শুরু করল। কমলা মুখ তুলে তাকাল আকাশে। গরমে চোখ পাতা যায় না। তাকাল ফুটপাথে। সেই বসন্তের ঘায়ের মত দাগ। বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, "কষ্ট কি আমি ইচ্ছে করে দি, সংসারে তুখ্যু বাড়ুক তা কি আমি চাই? কিন্তু তোর বাবার যে একটুও কাণ্ডজ্ঞান নেই। বারণ করলে রেগে ওঠে।"

"যার কাণ্ডজ্ঞান নেই তার রাগেরও কোন মানে নেই। আপিসে বসে মজা দেখছে হয়তো, আর আমরা এখানে—"

মুখ তুলল কমলা। ছেলের চোখে রাগ, ধমকানি, তুঃখ। ও এখন অন্যরকম হয়ে গেছে। ধ্বক্ করে উঠল কমলার বুক। ছেলেকে আর এখন চেনা যাচ্ছে না। মস্ত বড় হয়ে গেছে। বুঝতে শিখেছে, ধমকাতে শিখেছে। কিন্তু ও ধমকাচ্ছে কাকে! আমাকে? আমি কি দোষ করেছি! ইচ্ছে করে কি সংসারে অশান্তি এনেছি? ছেলেটা বাপের স্বভাব পেয়েছে, সব তাতেই রেগে ওঠে। এইটুকু ছেলে রাগে কেন? ওকি সংসারের হালচাল বুঝে ফেলেছে?

কমলা চুপ করে তাকিয়ে রইল। রাস্তার ওপারে ফুটপাথে ছায়া। খাটিয়ায় একটা লোক শুয়ে। কাঠ কাটছে একটা মেয়েমানুষ। হঠাৎ দমকলের ঘণ্টা বাজল। গাড়িগুলো রাস্তার কিনার ঘেঁষে এল। ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল একটা দমকলগাড়ি।

"আহারে, কাদের আবার কপাল পুড়ল।"

"যাদেরই পুড়ুক না, তোমার কি?"

"ক্ষতিতো হবে!"

"হোক্‌গে, তা ভেবে আমাদের কি হবে, বাড়ি পৌঁছতে পারব কি?"

ছেলের মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গেছে। খিদে পেয়েছে। পিচ গলে যাওয়ায় চড়বড় শব্দ হচ্ছে গাড়ির চাকায়। এখন অনেকখানি পথ হাঁটলে তবে বাড়ি পৌঁছন যাবে। ছেলেমেয়েগুলোকে শিকলি দিয়ে ঘরে আটকে রেখে এসেছে। তাদের খাওয়া হয়নি। গিয়ে উনুন ধরিয়ে রেঁধে খাওয়াতে হবে। ওরা এতক্ষণ কি করছে কে জানে। হুটোপাটি করে ঘরের জিনিস ভেঙেছে। বালিশ নিয়ে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলেছে। নিতুটার ভীষণ লোভ চিনিতে। দেয়ালে পা দিয়ে দিয়ে উঠে হয়তো শিশিটা সাবড়ে দিয়েছে। বাচ্চুর ঘরকন্নার কাজ খুব পছন্দ। কুঁজো থেকে জল ঢেলে, জামাটামা কিছু একটা দিয়ে ঘর মুছতে শুরু করেছে। কিন্তু কতক্ষণ ওরা খেলা করবে। খিদে পাবে, চীৎকার করবে, কাঁদবে। ওরাতো সব সময়ই চেঁচায়। পাশের বাড়ির লোকেরা শুনলে গ্রাহ্যই করবে না। হয়তো তারপর কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়বে। নিতুটা আগে ঘুমোবে। ওর স্বাস্থ্যটাই ভালো। অপুকে হয়তো বাচ্চুই ঘুম পাড়িয়ে দেবে। জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বাচ্চুটাও ঘুমিয়ে পড়বে এক সময়।

"আবার উঠছ কেন?"

"আর বসে থাকতে পারছি না রে। আমার কষ্ট হচ্ছে।"

"হচ্ছেতো যাও, আমি উঠতে পারব না।"

"তুই অমন করে আর কথা বলিসনি।"

"কেন বলব না, কেন পয়সা পর্যন্ত চেয়ে রাখ না?"

"আমায় যদি না দেয়, কি করতে পারি!"

"তুমি একটা বোকা। মান ইজ্জতটাই তোমার কাছে বড়, নইলে দারোয়ানটা পর্যন্ত—"

ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে কমলা ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ও বলছে আমি বোকা। তাহলে একটু আগে কেন আমায় চটি পরতে দিয়েছিল? ওর নিজের পা পুড়বে তা কি ও জানত না?

মুখ ঘুরিয়ে বসে আছে দীপু। কমলার চোখ টল্‌টল্‌ করছে। দোকানি টেবিলে থুতনি রেখে রাস্তার দিকে তাকিয়ে। এতক্ষণে একটাও খদ্দের আসেনি।

রোগা জির্‌জিরে একটা গরুকে দুটো লোক টানতে টানতে নিয়ে এল। ইলেকট্রিক পোস্টে বেঁধে লোকদুটো এধার ওধার তাকাচ্ছে। মুচকি হেসে গেল এক পিওন। খাটিয়ায় শোয়া লোকটা উঠে বসেছে। উরু থাবড়ে চা-ওলাকে ডাকল। সামনের বারান্দায় ঘোমটা দিয়ে এক বৌ এসে দাঁড়াল।

"শালা যা গরম পড়েছে। না যায় ঘরে বসে থাকা, না যায় বাইরে বেরোন!"

লুঙ্গির কসি আঁটতে আঁটতে দোকানি বেরিয়ে এল। গোরুটা চোখ বুঁজে জাবর কাটছে।

"উধার দেখো। গলিকা ভিতর একঠো হ্যায়।"

দোকানি হাত তুলে কাছের গলিটা দেখিয়ে দিল। দুটো লোকের একজন সেইদিকে গেল। একটা মাছি বসেছে গোরুটার পিঠে। থর্‌থরিয়ে চামড়া কাঁপাল। উঠে দাঁড়াল দীপু। হন্‌হন্‌ করে খানিকটা গিয়ে পিছু ফিরে তাকাল। কমলা সঙ্গে আসেনি।

"কিজন্য দাঁড়িয়ে আছ? চলে আসছ না কেন?"

কাছে এসে কমলা বলল, "তুই হঠাৎ এমনভাবে হাঁটতে শুরু করে দিলি যে—"

কথা না বলে দীপু হাঁটতে লাগল। ঘাড়টা নামান। হাত দুটো আড়ষ্ট। মুখ দেখে কিছু বোঝা যায় না।

পা জ্বলছে। জ্বলুক। ওকথা বললেই বিপদ। ছেলে হয়তো আবার বলবে, ছায়ায় দাঁড়াই। তাহলে বাড়ি পৌঁছন যাবেনা। কিংবা হয়তো চটিটা খুলে দেবে। তার চেয়ে এই ভাল। ওকে কষ্টের কথা জানতে না দিলেই হল। এখন অনেক রাস্তা হাঁটতে হবে।

"দীপু একটু আস্তে চ।"

দীপু দাঁড়াল। কমলা পাশে আসতেই বলল, "ওটাকে আমার কাছে দাও।"

"নারে বড্ড নরম, পারবি না।"

"খুব পারব।"

বাচ্চাকে দীপুর হাতে তুলে দিল কমলা। আস্তে আস্তে পা ফেলে চলতে লাগল দীপু।

"হ্যাঁরে, তোর মনে আছে বাচ্চুকে একবার ফেলে দিয়েছিলি?"

জবাব দিল না দীপু। কথা বলতে গেলে রাস্তা দেখে চলা যায় না ঠিক মত। ঠোক্কর খেয়ে পড়লে বাচ্চাটা বাঁচবে না।

"ঘ্যানঘ্যান করতিস বোনকে কোলে নেবো বলে। একদিন দিলুম কোলে তুলে, ওম্মা দেয়ামাত্তরই যেই দাঁড়াতে গেলি আর টলে পড়ে একসা কাণ্ড।"

"শালা খচ্‌রা কোথাকার।"

ইঁটটাকে লাথি মেরে দীপু ফুটপাথ থেকে রাস্তায় পাঠাল। হাতের পুঁটলিটা দুলিয়ে কমলা একটা খুকির মত হাসল। পায়ের তলার জ্বলুনিটা সয়ে এসেছে। রাস্তার সবটাই তো আর তেতে নেই। মাঝে মাঝে ছায়া আছে, জল আছে, মাটিও আছে।

"আচ্ছা বল্‌তো, এখন যদি তোর বাবার সঙ্গে দেখা হয়, কিংবা দারোয়ানটা এসে যদি বখশিসের ভাগ দিয়ে যায়! তাহলে ট্যাস্‌কি করে বাড়ি যাওয়া যায়, নারে?"

দীপুর দিকে আড়ে তাকিয়ে কমলা কুট করে বিস্কুট কামড়াল। তারপর আবার খুকির মত হাসল।

দিল। নাপিত নখ কাটছে ফর্সা বৌটার। ওর গায়ে জামা নেই, শরীরেও মাংস নেই। একলা বসে। স্বামী গাড়ি ডাকতে গেছে। নাপিতটা নতুন। মাথায় টিকি। টিকিওলা নাপিত কমলা কখনো দেখেনি। বাচ্চুর সময়ে ছিল বেঁটে গাঁট্টা-গোট্টা এক নাপিত। পোয়াতিরা খালাস হয়ে যাবার সময় এখানেই নখ কেটে যায়। সেবার ঝগড়া হয়েছিল। তু'আনার জন্য দীপুর বাপ হাতাহাতি করতে গেছল।

"হ্যাঁরে দীপু ছাখনা ক'পয়সা নেয়।"

"কি হবে দেখে।"

"তাহলে এখানেই কেটে নোব।"

দীপু উঠে গেল। একটা রিক্সা নিয়ে এল বৌটার স্বামী। দারোয়ান গাড়িবারান্দার তলায় রিক্সাকে দাঁড়াতে দিল না। বৌকে ধরে নিয়ে গেল লোকটা। কোমর ভেঙে গেছে। ধুঁকতে ধুঁকতে হাঁটছে। হঠাৎ কাপড়টা আলগা হয়ে পড়ছিল, একহাতে বাচ্চাকে অন্যহাতে কাপড়টা ধরে সে অসহায় চোখে কমলার দিকে তাকাল।

"অ দীপু, ভাইকে একটু ধর্‌তো।"

বাচ্চাকে দীপুর কোলে দিয়ে কমলা গিয়ে বৌটাকে কাপড় পরিয়ে দিল। হাঁ-করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। কমলা ধরে নিয়ে গেল রিক্সা পর্যন্ত। উঠতে পারছে না। রিক্সাগুলো এমন গড়ানে হয় যে কমজোরি লোক উঠতে গেলেই টলে পড়ে। বাচ্চাকে চেয়ে নিল কমলা। হামাগুড়ি দিয়ে বৌটা রিক্সায় উঠল। ওর স্বামীও উঠল। কমলা বাচ্চাকে কোলে তুলে দিল।

"আসি দিদি।"

"নামবার সময় সাবধানে নেবো।"

রিক্সাটা চলে গেল। আবার একটা ট্যাক্সি এল। হাত-আয়নাটা বাস্কেটে রেখে বাচ্চা কোলে বৌটা উঠে দাঁড়াল। বেশ শক্তসমর্থ গড়ন। কোন ফাঁকে বুকটাকে আঁট-সাট

করে নিয়েছে। বাচ্চাকে স্বামীর কোলে দিয়ে গটগটিয়ে ট্যাক্সিতে উঠল।

চলে গেল ট্যাক্সিটা। দরজা বন্ধ করে বখশিস পেল দারোয়ান। এখন গাড়িবারান্দার তলায় বাড়ি যাবার জন্য রইল শুধু কমলা।

দীপুর কাছ থেকে ছেলেকে কোলে নিয়ে মোটরের ধার ঘেঁষে কমলা মেঝেয় বসল। দীপু বসল বাম্পারে। দারোয়ান বসেছে তার টুলে, আর নাপিত সিঁড়িতে। হাসপাতালের ভিতর থেকে টুকটুক করে একটা বেড়াল নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে এক মাঝবয়সী দাই এসে তাকে কোলে তুলে নিয়ে গেল। খিলেনের কার্নিসে দু'তিনটে কাক উড়ে এল। অনেক দূরে, গোলাপি বেল্টআঁটা সাদা কাপড়ের টুপি পরা পাঁচ-ছটিমেয়ে খাতা হাতে চলে গেল। উত্তরের ছাই রঙের বাড়িটার তিনতলার বারান্দায়, টেবিল ঘিরে তাস খেলছে ক'জনে।

"নাপিতটা কতো নিল রে ?"

"আট আনা।"

"তোর বাবা ভোলাকে বলে রেখেছে তো ?"

"কি জানি। ভোলাতো বারটা পর্যন্ত পাড়ায় থাকে। এখন গেলে হয়তো পাওয়া যাবে।"

"দ্যাখনা একটু, তোর বাবা আসছে কিনা।"

"দেখলেই কি বাবা তাড়াতাড়ি আসবে ?"

দীপু ঝেঁঝে উঠল। বাতাসে হল্‌কা আসছে। বাচ্চাকে আঁচল দিয়ে কমলা ঢেকে দিল। উত্তর-পূবের লালবাড়িটা থেকে তর-তরিয়ে দুটি মেয়ে নেমে গেল। দীপু ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে রইল। একটু গিয়েই ওরা বেঁকে গেল।

"মা তোমার কাছে পয়সা আছে ?"

"বারোটা পয়সা আছে, কেন ?"

"কতক্ষণ বসে থাকব ?"

"উনি কখন আসেন, কে জানে।"

হেসে উঠল নাপিতটা। আর খদ্দের নেই তবু বসে গল্প করছে। দারোয়ানকে খুশি না রাখলে এখানকার পসার বন্ধ হয়ে যাবে। দীপু উঠে গিয়ে দরজার পাশে টাঙানো রুগী দেখবার নিয়ম পড়তে শুরু করল। কমলা তাকাল বাগানের দিকে। হাওয়া আসছে, তবু গলগলিয়ে ঘাম নামছে। চমকে উঠে হাত ছুঁড়ল বাচ্চাটা। স্বপ্ন দেখছে। বোধহয় গতজন্মের কথা ভাবছে। ঠোঁট নড়ছে। হাসছে। নাকি খিদে পেয়েছে। মোটরটার দিকে পিছন ফিরে মুখে মাই গুঁজে দিল কমলা। চনমন করে মুখ সরিয়ে নিল। চোখ বুঁজেই আছে। বড্ড আলো, কচি চোখে সইবে কেন। আঁচল দিয়ে বাচ্চাকে আবার ঢেকে দিল কমলা। আঁচলের নীচে নড়ছে। আঁচল ফাঁক করে দেখল। হাত পা কুঁকড়ে গুটিয়ে রয়েছে। কালো ঠোঁট দুটো নড়ছে। কি ছিল ও আগের জন্মে, রাজার ছেলে? গতজন্মের কথা মনে পড়ে হাসছে?

"হ্যাঁরে দীপু ট্যাস্কির ভাড়া বুঝি কম? সবাই যে গেল।"

দীপু সাড়া দিল না। ঘাড় তুলে সে নিয়ম পড়ছে।

"এখান থেকে আমাদের বাড়ি যেতে কত নেবে রে?"

দীপু এবারও সাড়া দিল না। কমলা দীপুর থেকে চোখ সরিয়ে ফড়িংটার ওপর রাখল, ওটা এইমাত্র মোটরের টায়ারে এসে বসেছে, তারপর রাখল বাচ্চার উপর। বাচ্চাকে দুহাতে দোলাল। বড্ড হালকা। কালো বেল্টপরা নার্সটি হেসে হেসে বলেছিল, কি সুন্দর বেবী। আহা, বড় ভাল মেয়েটি। বলেছিল দেখা করবে।

কমলা দূরের বারান্দায় তাকাল। একটাও মানুষ নেই। কে থাকবে এই গরমে। তাছাড়া ওর ডিউটিতো ওধারে দক্ষিণের বারান্দায়। কালকে এমন সময় দেখা হয়েছিল। কাঁদ কাঁদ মুখ করে ছুটে আসছিল। কে একজন নাকি বাড়ি যাবার সময় হাতে আট আনা পয়সা গুঁজে দিয়েছে।

"দীপু একটু নজর করিসতো, সেই কপালে কাটা দাগ আমাদের নার্সটিকে যদি দেখতে পাস। আমাকে খুব যত্ন করেছিল।"

"তাকে দেখব কি করে, সেতো ওয়ার্ডে এখন।"

"তবু যদি এদিকে এসেটেসে পড়ে। এক জায়গায় বসে তো আর কাজ কর্তে হয় না।"

দীপু আগের মত বাম্পারে বসে গাড়ির পিঠে মাথা রাখল।

"আর গোটাকতক পয়সা থাকলে বাসে চলে যেতুম।"

কমলা মুখ ফিরিয়ে নিল। পা ছড়িয়ে দিল রোদ্দুরে। সিমেণ্ট তেতে উঠেছে। উপুড় হয়ে শুয়ে থাকলে সেঁকের কাজ হয়ে যাবে। দেয়ালে ঠেশ দিয়ে সে চোখ বুঁজল।

"এই ওঠো, ওঠো।"

ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে দারোয়ান। যার মোটরগাড়ি সে এসে গেছে। উঠে দাঁড়াতে ভুলে গেল দীপু তার দিকে তাকিয়ে।

লেডি ডাক্তার দীপুকে নজর না করেই গাড়িতে উঠে বসল। শেল্‌ফ স্টার্টারের বোতাম টিপল। খর খর করে উঠল এঞ্জিন, স্টার্ট হল না।

গাড়ি ঘেঁষে কমলা বসেছিল। লেডি ডাক্তারের মুখটুকু শুধু দেখতে পাচ্ছিল সে। সুন্দর কপাল, সুন্দর রঙ, সুন্দর চুল।

আবার শব্দ হল স্টার্টারের। বিচ্ছিরী শব্দ। এত সুন্দর গাড়িটা যেন কঁকাচ্ছে। বারকয়েক এমন হবার পর লেডি ডাক্তার গাড়ি থেকে নামল। নিচু হয়ে গাড়ির তলা দিয়ে কমলা শুধু গোড়ালি আর সায়ার লেশ দেখতে পেল।

নাপিত আর দারোয়ান এমন মুখ করে দাঁড়িয়ে যেন গাড়ি স্টার্ট না হবার দোষটুকু তাদেরই। দীপু কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ। হঠাৎ মনে হল, তার পা দুটো খুব সরু আর লোমগুলো বড্ড ঘন। থুতনিতে বড় বড় চুল মুখটাকে কুচ্ছিত করে রেখেছে। মোটরের আড়ালে সরে এসে সে গালে হাত বোলাল। আঙুলে একটা ব্রণ ঠেকল।

"গাড়িটা একটু ঠেলে দাওনা।"

বলার ভঙ্গিটা আবদেরে। স্বরটা ঠিনঠিনে। নাপিত আর দারোয়ান সঙ্গেসঙ্গে গাড়ির পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। গাড়িটা মস্ত। ওরা দুজনেই বুড়ো। জায়গাটা খাড়াই। ওদের পিঠ বেঁকে গেল, পায়ের ডিম শক্ত হল, তবু গাড়িটাকে নড়ানো গেল না।

"হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন, গিয়ে ঠেল না?"

"আমি কেন ঠেলব?"

"আহা, মানুষ বিপদে পড়েছে সাহায্য করবি না! একটুখানি ঠেলে দিলেই বুঝি মান-ইজ্জত খোয়া যায়?"

দীপু গিয়ে হাত লাগাল। নড়ে উঠল গাড়িটা। মুগ্ধ কমলা তাকিয়ে রইল দীপুর কনুইয়ের কাছের গুড়ি গুড়ি পেশীর দিকে। উঁচু দিকটা কাবার হয়ে, ঢালুতে পড়েই গাড়ির গতি বাড়ল। ঝকাং করে ক্লাচ পড়ল। গরগরিয়ে উঠল এঞ্জিন। গাড়িটা কিছুটা ছুটে গিয়ে থামল। হাত নেড়ে লেডি ডাক্তার ডাকছে। দারোয়ান আর নাপিত ছুটে গেল। ওদের হাতে কি যেন দিল, বোধহয় বখশিস।

দীপুর হাঁটুর কাছে নুনছাল উঠে গেছে। ক্লাচ দিতে থমকে যায় গাড়িটা, তখনই মাডগার্ডের ধারটা লেগেছিল।

সামনের বাগানটা চক্কর দিয়ে গাড়িটা পূবদিকে চলে গেল। কমলা তাকিয়ে রইল ওইদিকে। অল্প অল্প ধোঁয়ার গন্ধ আসছে। বেশ লাগে শুঁকতে।

"ওরা পয়সা নিল।"

"দিল বুঝি?"

"হুঁ।"

"ওরা তো নেবেই।"

"আমায় দিলে ছুঁড়ে ফেলে দিতুম।"

"তোকে দিতই না। শিক্ষিত তো, মানুষ চেনে। কাকে দিতে হয় না হয় বোঝে।"

"পয়সাটা দুজনে ভাগাভাগি করে নেবে।"

"তাতো নেবেই।"

"আমায় যদি দিতে আসে ?"

"আসবে না।"

"আমি না ঠেললে গাড়ি চলত না।"

নাপিত আর দারোয়ান এতক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়েই কথা বলছিল। নাপিত চলে গেল। দারোয়ান ওদের কাছে এসে দাঁড়াল।

"আপনারা যাবেন কখন ?"

"এই তো এক্ষুনি যাব।"

"দেরি করলে আরো গরম পড়বে, বাচ্চার কষ্ট হবে। কাল একশো পাঁচ ডিগ্রি হয়েছিল।"

ওরা দুজনেই মুখ ঘুরিয়ে রইল। দারোয়ান টুলে গিয়ে বসল।

"কি বলেছিল আসবে তো ?"

"হ্যাঁ, ছুটি করিয়ে চলে আসবে বলেছিল, বোধহয় কাজের তাড়া পড়েছে।"

"জানি, তোকে আর বোঝাতে হবে না। যত কাজ ওর আজকেই।"

"বোধহয় ছুটি পায়নি। অফিসে খুব গোলমাল চলছে বলছিল। বারোজনের চাকরি গেছে, সবাই ভয়ে ভয়ে রয়েছে।"

"একটা দিন ছুটি নিলে কি চাকরি যেত ?"

উবু হয়ে বসল দীপু। মুখ ফিরিয়ে রয়েছে কমলা। রসালো লেবু চুষলে অমন হয় ঠোঁট দুটো। ছেলেমানুষের মত দেখতে হয়ে গেছে। দীপু বাচ্চাটার গালে আঙুল ছোঁয়াল। ওকে কনুই দিয়ে ঝট্‌কা দিল কমলা।

"মা, তোমাকে এখন বাচ্চুর মত লাগছে কিন্তু।"

উঠে পড়ল কমলা। কাপড়ের পুঁটলিটা এক হাতে নিয়ে গেটের দিকে চলতে শুরু করল। দীপু পিছু নিল।

"কোথায় যাচ্ছ ?'

কথা বলল না কমলা। গেটের বাইরে এসে দাঁড়াল সে। এধার ওধার তাকিয়ে দিশা করতে পারল না কোন দিকে যেতে হবে।

"বাড়ি যাবে নাকি ?"

"হ্যাঁ।"

"কি করে যাবে !"

"হেঁটে যাব। কোনদিকে যাব বল ?"

থুতনি তুলে দীপু উত্তরদিক দেখাল। হাঁটতে শুরু করে দিল কমলা। পা ফেলছে আর আঙুলগুলো কুঁকড়ে যাচ্ছে। দীপু চটি থেকে পা বার করে ফুটপাথে রেখেই চমকে তুলে নিল।

"ওই বারান্দাটার তলায় দাঁড়াই !"

মাথা নামিয়ে চলছিল কমলা। চলতেই লাগল। ওর হাত ধরে দীপু ছায়ায় টেনে আনল।

"হেঁটে বাড়ি যাওয়া যাবে না।"

"এই তো যাচ্ছি।"

"রেগে গেছ বলে কষ্ট লাগছে না। সারা রাস্তাতো আর রাগতে রাগতে যাওয়া যায় না।"

"তবে কি করবো ?"

"ফিরে যাই। হয়তো বাবা এসে পড়েছে। তাহলে ট্যাক্সিতে যাওয়া যাবে।"

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কমলা। রাগ করে চলে আসাটা বোধ ঠিক হয়নি। এমন করে কি বাড়ি পৌছন যায়। যেতে যেতেই পায়ের তলা ঝলসে যাবে। শরীরের ব্যথাও মরেনি, চলতে কষ্ট হয়। এত গরম বাচ্চাটাই বা সইবে কি করে।

ওদের দেখে দারোয়ান কাছে এল। দীপুকে লক্ষ করে জিগ্যেস করল, "গেলে না যে !"

চুপ করে রইল দীপু। এবার কমলাকে সে জিগ্যেস করল, "নিতে আসার কথা আছে বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

দারোয়ান চাবির তোড়া বাজাতে বাজাতে চলে গেল। কোথা থেকে কান্নার শব্দ আসছে। শব্দটা এগিয়ে আসছে। এসে পড়ল। দুই বুড়ি কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। রাস্তা থেকে লরীর টায়ার ফাটার শব্দ এল। কাক ডাকছে।

"ব্যাটা দরদ দেখিয়ে গেল।"

"কে?"

"আমি না থাকলে ওর বখশিস জুটত না।"

"লোক ডেকে গাড়ি ঠেলত।"

"তাদের তো পয়সা দিতে হত।"

হলকা আসছে। বাচ্চাটা আরও ছোট হয়ে গেছে যেন। বুকের আরো কাছে কমলা জড়িয়ে ধরল। দীপুর কানের পিছন দিয়ে ঘাম গড়াচ্ছে। আঁচল তুলে মুছিয়ে দিতে গেল, মাথা সরিয়ে নিল দীপু। জামার হাতায় মুছে নিল।

"একটা রিক্সা করে চলে যাই চলো।"

"পয়সা?"

"তুমিতো জমিয়ে রাখ।"

"কে বললো?"

"সেদিন দুপুরে যে বাসনওলাকে ডাকলে।"

"সে তো ওমনি ওমনি ডেকেছিলুম, কিনেছি নাকি?"

"তাহলে দোতলার বৌদির কাছে ধার নিলেই হবে।"

"ধার করতে হবে না।"

"তা বলে সারাদিন এখানে বসে থাকব নাকি?"

"তুই অত রেগে উঠছিস কেন? অধৈর্য হোস কেন? ছাখনা উনি হয়তো এসে পড়বেন।"

"আমার খিদে পেয়েছে।"

দীপু দ্রুত এসে ফুটপাথে দাঁড়াল। কমলা আসতেই চটিটা খুলে এগিয়ে দিল।

"কি হবে?"

"পরো, নইলে চলবে কি করে?"

"তুই?"

ততক্ষণে দীপুর পায়ের চেটো জ্বলতে শুরু করেছে। ছুটে সে গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াল। রাস্তার গাছ। লিকলিকে তার ছায়া।

"দাঁড়িয়ে কেন, হাঁটতে আরম্ভ করো।"

অবাক হয়ে কমলা ওর কাণ্ড দেখছিল। চটি পরা অভ্যাস নেই। আঙুল দিয়ে ফিতেটাকে আঁকড়ে থপথপিয়ে একটু হেঁটেই থেমে গেল। দীপু পায়ে পা ঘষছে। হেসে ফেলল কমলা।

"ধ্যেৎ, আমি কি এমনভাবে চলতে পারি?"

"নইলে দেরী হয়ে যাবে। অপু, নিতুদের এখনও খাওয়া হয়নি।"

গাছের ছায়ায় কমলা এসে পৌঁছতেই দীপু আবার ছুট লাগাল অনেক দূরে একটা হাইড্রেণ্ট লক্ষ করে। দুটো লোক স্নান করছে। জলে পা ভিজিয়ে দীপু দাঁড়াল। কমলা অনেক দূরে। ছেলে কোলে, পুঁটলী হাতে থপথপিয়ে আসছে। দুহাতে জল নিয়ে দীপু মাথায় থাপড়াল।

"অ দীপু, অমন করে তুই কত ছুটবি?"

"দাঁড়ালে কেন, হাঁটো।"

"নিতুটাকে বার্লি দিয়েছিস্ তো?"

"হ্যাঁ।"

"ওরা চৌবাচ্চায় নাববে না তো?"

"না, না, না, তুমি হাঁটো।"

আবার ছুটল দীপু। এবার একটা রিক্সার আড়ালে। রিক্সা-ওয়ালা হুড ফেলে সিটের উপর বসেছিল। কমলাকে তার দিকে তাকিয়ে আসতে দেখে নেমে দাঁড়াল। দীপুও লক্ষ করেছে, কমলা রিক্সাটার দিকে কেমন কেমন করে তাকাচ্ছে।

"মা, রিক্সায় ওঠো।"

"ধার করলে তোর বাবা রাগ করবে।"

"জানবে কি করে?"

"তাহলে কার কাছ থেকে নিয়ে ধার শুধবি।"

"তবে বাবা এলনা কেন? কেন আমায় পয়সা না দিয়ে পাঠাল?"

চীৎকার করল দীপু। চোখে জল এসে গেছে। ঠোঁট কাঁপছে।

"অ দীপু, তুই চুপ কর।"

"কেন করব? তোমার জন্যই তো এই কষ্ট। দারোয়ানটার কাছ থেকে ঠিক ভাগ আদায় করে নিতুম।"

"দীপু, তুই রিস্কায় ওঠ্, আমি ধার শোধ করে দেব।"

দীপু রিক্সার ছায়া থেকে বেরিয়ে নর্দমায় পা রেখে দাঁড়াল।

"লক্ষ্মীছেলে আমার।"

"না।"

"রিস্কায় ওঠ্।"

"না।"

দীপু চোখ সরিয়ে নিল। কমলার চোখের থেকে দূরের রাস্তা অনেক ঠাণ্ডা। রিক্সাওয়ালা সিটে উঠে বসল। ঘাম গড়াচ্ছে কমলার গাল বেয়ে। ভুরু ভিজে গেছে। চোখ জ্বলছে। ঘাড়ে চোখ ঘষল। চোখ দুটো গর্তে বসে গেছে। শুকনো বাতাসে চুল উড়ে পড়ল কপালে। ঠোঁট চাটল কমলা। গলার নলিটা তুলতুল করে কাঁপছে।

"এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে, চল ওখানটায় বসি।"

মনোহারি দোকানটার সিঁড়িতে ছায়া। দীপু সিঁড়িতে বসল। কমলা এলনা। উঠে এসে দীপু ওর হাত ধরে টানল।

"আমি যাবনা।"

মাকে হু'হাতে জড়িয়ে দীপু টেনে আনল। দোকানি খবরের কাগজ পড়ছিল। ওদের দেখে নিয়ে আবার পড়তে শুরু করল।

"মা তোমার খিদে পেয়েছে।"

"না।"

"না কেন, এত বেলা হয়েছে!"

"বেলায় খাওয়া আমার অব্যেস।"

ঘাড় ফিরিয়ে কমলা দোকানের ভিতর তাকাল। সারি সারি বোয়েমে বিস্কুট আর টফি।

"তোর খিদে পেয়েছে?"

"না।"

"বললেই বিশ্বাস করবো! সাড়ে নটাতেই ভাত ভাত করে চীৎকার করিস না?"

"তোমারও তো পেয়েছে।"

"আমার গা গুলোচ্ছে। খেলে বমি হয়ে যাবে।"

আঁচল থেকে বারোটা পয়সা খুলে দিল। বিস্কুট কিনল দীপু। খেতে খেতে আড়চোখে দেখল কমলা তার খাওয়া দেখছে। দুর্গা প্রতিমার মত হাসিটা, মানে বোঝা যায়না। শেষ বিস্কুটটা এগিয়ে দিল দীপু।

"না, তুই খা।"

বাচ্চার বুকের ওপর বিস্কুটটা রাখতেই গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল, কমলা ধরে ফেলল। দীপু মুখ ঘুরিয়ে সরে বসল। জিভ দিয়ে মাড়ি পরিষ্কার করে, টাকরায় শব্দ করল।

কমলা তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে একদৃষ্টে। ফুটপাথে বসন্তের ঘায়ের মত দাগ। অনেক দিনের অনেক লোকের হাঁটা

চলায় জায়গায় জায়গায় দাগগুলো মিলিয়ে গেছে। দীপুর বাবার মুখের দাগগুলো এখনো মেলায়নি। তখন অনেকেই বলেছিল কচি ডাবের জলে মুখ ধুতে, ধোয়নি। এই ফুটপাথের মত হয়ে আছে ওর মুখটা। কত রোদ, বৃষ্টি, মানুষের পায়ের ধাক্কা খেয়েছে এই ফুটপাথ। মানুষটাও ক্যাপাটে হয়ে গেছে। ক্ষেপলে মুখটা বাটনা বাটা শিলের মত হয়ে যায়। একঘেয়ে, রোজকার অভ্যাস। আয় বাড়ছে না, ঘর বাড়ছে না, খাটুনিরও কামাই নেই।

"কেন যে এমন করে। এতে আমার কি দোষ, আমি কি করতে পারি, উঁ।"

ফুটপাথের দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে নিজের মনেই কমলা বলল। বাচ্চার গলায় সুতোর মত ময়লা। সাবধানে তুলে ফেলে দিল। মাথায় হাত বোলাল। চুল নেই বললেই হয়। দীপুটারও ছিল না।

আস্তে আস্তে কমলার শূন্য চোখ ভরাট হয়ে উঠল। হাসল সে।

"তোর বেলায় ট্যাস্‌কি করে এসেছিলুম।"

"সে কথা তো বললে।"

"বলেছি নাকি! তুই এর থেকেও বড়সড় হয়েছিলি, বলেছি? হয়েই কি কান্না। এটা কিন্তু একদম কাঁদেনি।"

বাচ্চার ঠোঁট নড়ছে। বোধহয় খিদে পেয়েছে। কমলা মাই গুঁজে দিল ওর মুখে। দীপু আড়চোখে দোকানির দিকে তাকাল। এইদিকেই তাকিয়েছিল, চোখে চোখ পড়তেই কাগজটা তুলে ধরল।

"তোর ষষ্ঠী পূজোর দিন একটা ধনেখালি ডুরে পেয়েছিলুম। ঠাকুরঝির বিয়েতে খোঁচা লেগে ছিঁড়ে গেছল। পর্দা করেছিলুম।"

"আমাদের পর্দা ছিল।"

"বড্ড খিদে পাচ্ছে।"

"পাবেই তো। ভাত না খেলে মনে হয় খাওয়াই হল না।"

"দেখ্‌না কিছু যদি পাওয়া যায়। দেখেছিস কি সুন্দর ডাব হয়েছে।"

"পাড়বে কে, অরুণতো উঠতে গিয়ে পারল না। আজ যদি ওদের মালিটা থাকত।"

"তার বাবাকে এই সময়ই বাঘে খেলো।"

"আমি ডাব পাড়তে পারি।" শিবু হঠাৎ বলে উঠল।

ওরা গ্রাহ্য করল না কথাটা। শিবু আবার বলল, "যদি পাড়তে পারি তাহলে কি দেবে?"

"তা হলে?" শীলা চোখ সরু করে বলল, "আমাদের যাকে চাও ওই ঘরে নিয়ে যেতে পারবে।" আঙুল দিয়ে বাগানের মাটির ঘরটা দেখাল। শিবু কথাটার অর্থ বুঝতে না পেরে বলল, "তাহলে আজ সকাল থেকে যা-যা ঘটেছে সব ভুলে যাবে, বলো?"

"হ্যাঁ যাব। কিন্তু যদি না পাড়তে পারো?" দীপালি তেরিয়া হয়ে এগিয়ে গেল কয়েক পা। একটু ভেবে শিবু বলল, "তাহলে অন্য কলেজে ট্রান্সফার নোব।"

"না, না। তোমাকে পারতেই হবে। এইটে অন্তত পারতেই হবে।" করুণা অদ্ভুত গলায় বলল। শিবু অবাক হয়ে তাকিয়ে উত্তেজিত হিংস্র, এবং কাতর চারটি মুখ থেকে কোন অর্থ বার করতে পারল না।

খালি গায়ে, পাজামাটা উরু পর্যন্ত গুটিয়ে, শিবু প্রায় চারতলা উঁচু একটা নারিকেল গাছে ওঠার চেষ্টা শুরু করল। ওরা গাছটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। কয়েক হাত উঠেই সে নেমে এল।

"পেটে বড্ড চাপ লাগছে।"

"জানতুম এইরকম একটা অজুহাত দেবে।" দীপালি স্থান ত্যাগ করার ভঙ্গি করল।

শিবু কথা না বলে আবার ওঠার চেষ্টা শুরু করল। ধীরে ধীরে সে দোতলার উচ্চতা পার হল। চারটে মুখে বিস্ময় ফুটল। শিবু তিনতলার কাছাকাছি পৌঁছচ্ছে। একজন হাততালি দিয়ে উঠল। শিবু গাছটাকে জড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। দুটো পা পিছলে যাচ্ছে বারবার, আঙুলগুলো বেঁকিয়ে আঁকড়ে ধরতে চাইছে, পারছে না। একটা ইঁটের টুকরো কুড়িয়ে শীলা শাসানি দিল, "শিবু খবরদার। একইঞ্চি নেমেছো কি ইঁট ছুঁড়ে মাথা ফাটিয়ে দোব।" এই বলে সে ইঁট ছুঁড়ল। ঠক করে গাছে শব্দ হতেই ধড়ফড়িয়ে শিবু ওঠার চেষ্টা আরম্ভ করল। কয়েকহাত উঠে আবার সে জড়িয়ে রইল গাছটা। শরীর থরথর করে কাঁপছে, নিঃশ্বাস নিতে হাঁ করল, একটুখানি পিছলে নেমে এল !

সঙ্গে সঙ্গে চারটি মেয়েই ইঁট কুড়িয়ে এলোপাথাড়ি ছুঁড়তে শুরু করল।

"পারতে হবে। পারতেই হবে, নইলে নামতে দোবনা।" উন্মাদের মত দীপালি চীৎকার করে উঠল।

"আর একটু বাকি। শিবু চেষ্টা করো, চেষ্টা করো।" করুণা জোরে ইঁট ছুঁড়ল। শিবুর পাশ দিয়ে সেটা এবং এধারে শিবু, একসঙ্গে পড়ল। মাথাটা প্রথমে পাঁচিলে পড়ল সেখান থেকে দেহটা ছিটকে এল হাত পাঁচেক দূরে। বারকয়েক পা দুটো খিঁচিয়ে শিবু মরে পড়ে রইল।

ওরা কেউ কাছে এগোল না। সুপ্রিয়াই প্রথম জড়ানো স্বরে টেনে টেনে বলল, "আমি মোটে দুবার ছুঁড়েছিলাম, অনেক দূর দিয়ে চলে গেছে।"

শীলা শান্ত গলায় বলল, "কারুর ইঁটই ওর গায়ে লাগেনি। বোকার মত ওঠার চেষ্টা করেছিল, এটা অ্যাকসিডেন্ট।"

তখন ঘুরে দাঁড়িয়ে সুপ্রিয়া ছুটতে ছুটতে সেই মাটির ঘরের দরজায় আছড়ে, হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। ব্যস্ত হয়ে ঘর

জীবনযাপন প্রণালী

ঠিক দশটায় অফিসে নিজের চেয়ারে বসেই প্রদ্যোত লক্ষ করল, চাপা উত্তেজনা আর চাহনি নিয়ে এ ওর সঙ্গে কথা বলছে। জ্যোতিভূষণ পাশের চেয়ারের লোক। তিনি এখন রমেনদের টেবলের জটলায় গিয়ে একমনে আলোচনা শুনছেন। প্রদ্যোত ড্রয়ার থেকে জলখাবার গ্লাস, পেপারওয়েট, লাল-নীল পেনসিল, পিন-কুশন ইত্যাদি বার করতে করতে ভাবল, জেনারেল ম্যানেজারের ঘরের সামনে কি আজও আবার ডিমনস্ট্রেশন আছে? মিসেস চক্রবর্তীর পাঁচ সপ্তাহের মেডিক্যাল লীভ শেষ হতেও তো দিন দশ বাকি! তরুণ দত্তের অফিসার গ্রেড 'সি'-তে ওঠা হল না, সেটাও তো দু' সপ্তাহ আগে সবাই জেনে গেছে। তা হলে?

"কাশীনাথ, জল দিয়ে যা।" হাঁক দিল প্রদ্যোত। ওর গলার আওয়াজে জ্যোতিভূষণ ফিরে তাকালেন এবং ব্যস্ত হয়ে ফিরে এসে উত্তেজিত স্বরে বললেন, "শুনেছ? মৃত্যুঞ্জয় লটারির সেকেণ্ড প্রাইজ পেয়েছে! চল্লিশ হাজার টাকা!"

শোনামাত্র প্রদ্যোতের মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "টাকাগুলো পেয়ে ও কী করবে?"

জ্যোতিভূষণ একটু অপ্রস্তুতে পড়লেন। ভেবেছিলেন প্রদ্যোত বলবে,—য়্যাঁ! কিংবা শুধুই, ওর চোখ দুটো বেরিয়ে আসতে আসতে চোয়ালটা ঝুলে পড়বে। কিন্তু এই রকম কিছু না হওয়ায় কিঞ্চিৎ

অবাক হয়েই জ্যোতিভূষণ বললেন, "কি আবার করবে, ব্যাঙ্কে রাখবে সুদ পাবে।"

পিছন থেকে বিশ্বনাথ দাশগুপ্ত চাপাস্বরে বলল, "প্রদ্যোতদা জানেন এই টাকাটা আমিই পেতুম।"

প্রদ্যোত ঘুরে বসে বলল, "কি রকম ?"

"দারোয়ান খুশিরাম আমার কাছে যখন টিকিট বেচতে এসেছিল মৃত্যুঞ্জয় তখন দাঁড়িয়ে। আমিই ডেকেছি ওকে পান আনতে দোব বলে। পকেটে ছিল একটা পাঁচ টাকার নোট আর আনা ছয়েক পয়সা। ভাবলুম, নোটটা ভাঙালেইতো খরচ হয়ে যাবে, তাই খুশিরামকে বললুম, কাল এসো। ও তখন বই থেকে টিকিট ছিঁড়ে ফেলেছে। মৃত্যুঞ্জয় হঠাৎ পকেট থেকে একটা টাকা বার করে কিনে ফেলল টিকিটটা। অথচ কোনদিন কোন লটারির টিকিট এর আগে ও কাটেনি আর আমি চার বছর ধরে কেটে যাচ্ছি। যদি তখন নোটটা ভাঙিয়ে কিনেই ফেলতুম—"

প্রদ্যোত দেখল অসহ্য যন্ত্রণা যুবকটির সারা মুখ কুপিয়ে যাচ্ছে। সেটা বন্ধ করার জন্য তাড়াতাড়ি সে বলল, "টাকা পেলে করতে কী ?"

বিশ্বনাথ তাই শুনে মৃদু হেসে ঝুঁকে একটা ভারী লেজার বই টেনে পাতা ওলটাতে শুরু করল। তারপর যখন বুঝল উত্তরের আশায় প্রদ্যোত তখনো তাকিয়ে, সে রাগত স্বরে বলল, "এখনো তিনটে বোনের বিয়ে আমাকেই দিতে হবে। টিপে টিপে খরচ করি, সখটখ শিকেয় তুলে দিয়েছি। কিন্তু আমি কেন ওদের জন্য সাফার করব বলতে পারেন ? বাবা তো ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে সটকে পড়ল।"

প্রদ্যোত ঘুরে বসে নিজের কাজে হাত দেবার আগে বিশ্বনাথের হতাশ এবং ক্রুদ্ধ মুখটিকে মন থেকে মুছে ফেলার জন্য জ্যোতিভূষণের সঙ্গে কথা শুরু করল।
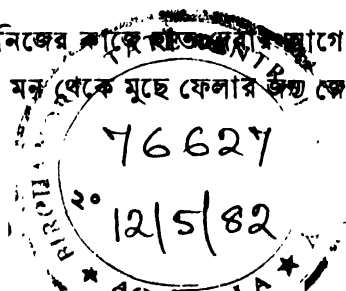
"মৃত্যুঞ্জয়কে দেখছি না যে, অফিসে আসেনি ?"

"কে জানে।" তাচ্ছিল্যভরে জ্যোতিভূষণ বললেন, "সারা জীবন পিওনের চাকরি করে যে টাকা পেত না, শুধু এক টাকা খরচ করেই ব্যাটা তা পেয়ে গেল। এ সব হচ্ছে স্টারস অ্যাণ্ড প্ল্যানেটসের কারচুপি। নয়তো ওর মত একটা লোকের অতগুলো টাকা পেয়ে যাওয়ার কোন মানে হয় ?"

"কেন মানে হয় না ? ওর নিশ্চয় চাহিদা আছে, টাকা দিয়ে এবার সেগুলো পূরণ করবে।"

"চাহিদা ! মৃত্যুঞ্জয়ের ?" জ্যোতিভূষণ বিস্ময়ের চাপে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। "জানেন কি, ওর ঘরভাড়া কত লাগে ? সারাদিনে খাওয়ার জন্য কত খরচ করে ? বছরে জামাকাপড়ে কত খরচ ? ওর ফ্যামিলি মেম্বার কজন ?"

প্রদ্যোত নঞর্থক মাথা নাড়ল।

"তাহলে বলেন কি করে যে ওর চাহিদা আছে ? আপনার-আমার স্ট্যাণ্ডার্ড দিয়ে বুঝলে তো হবে না। ওর কাছে চল্লিশ হাজার, আমাদের স্ট্যাণ্ডার্ডের দশ লাখ।"

"দশ লাখ পেলে আপনি কি করবেন ?"

প্রশ্নটায় জ্যোতিভূষণ বিব্রত হয়ে পড়লেন। সেই সময় প্রদ্যোতের পিছনে বিশ্বনাথ গুন গুন করে উঠল—"লাক্, বুঝলেন প্রদ্যোতদা, জীবনে একবারই আসে। আমার কাছেও এসেছিল। বাট আই অ্যাম অ্যান ইডিয়ট, ফুল, রাস্কেল, সোয়াইন, বাস্টার্ড। আর আসবে না। আই অ্যাম ডুম্‌ড। আর আসবে না। আর টিকিট কিনে পয়সা নষ্ট করব না।"

জ্যোতিভূষণ বললেন, "একটু ভেবে বলতে হবে। অনেকগুলো টাকা তো।"

কাজ করতে করতে প্রদ্যোতের মনে হল—যদি চল্লিশ হাজার টাকা পাই তাহলে আমিই বা কি করব ? কিছুক্ষণ আজেবাজে চিন্তা

করে হাল ছেড়ে সে কাজে মন দিল। এক সময় কে. বি. মুখার্জির টেবল থেকে দারুণ হাসির আওয়াজ আসতে প্রদ্যোত তাকাল। মুখার্জি নিজের টাক মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলছে, "আমি যদি পেতুম তাহলে একটি হেয়ার রিসার্চ ইন্সটিটিউট করে সব টাকা তাতেই দান করে দিতুম। আঠারোটা সম্বন্ধ ভেঙে গেছে ভাই।" করুণা গুহ তাই শুনে ছোপধরা দাঁতগুলো মেলে ধরে বলল, "চল্লিশ হাজার টাকা দেখলে আচ্ছা আচ্ছা মেয়েও তোর পায়ে লুটিয়ে পড়বে রে শালা।"

প্রদ্যোত এই পর্যন্ত যাবতীয় ব্যাপার দেখে ও শুনে আবার কাজে মন দিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই তার মনে হল, একটা প্রশ্ন যেন মাথার মধ্যে বিঁধে খচখচ করছে। সেটাকে উপড়ে না ফেলা পর্যন্ত বোধহয় স্বস্তি পাবেনা। আমার চাহিদা কী? এই প্রশ্নটার সম্মুখীন বাইশ বছর চাকরী করার পর হতে হবে, প্রদ্যোত তা জানত না। এই ব্যাপারটা নিয়ে সে ভাবল কাজ করতে করতে, বাড়ি ফেরার কালে বাসের মধ্যে দমবন্ধ হওয়া অবস্থায়, হায়ার সেকেণ্ডারী পড়া ছোট ছেলেকে একই অঙ্ক বারংবার বোঝাবার ফাঁকে এবং স্ত্রীর পাশে শুয়ে। অবশেষে সে সিদ্ধান্তে পৌঁছল, লটারীর একটা ফার্স্ট বা সেকেণ্ড প্রাইজ না পাওয়া পর্যন্ত বোঝা সম্ভব নয় তার চাহিদাটা কী! কেননা, এখন তার মনে হচ্ছে, জেনারেল ম্যানেজার পদ, সুশ্রী বুদ্ধিমতী স্ত্রী, প্রতিভাবান পুত্র, স্বাস্থ্য, মনোবল প্রভৃতি যেসব জিনিসের কথা সে ভেবেছে তার কোনটিই লটারীর টাকার বিনিময়ে সংগ্রহ করা যায় না। নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা হাতে এলে তবেই সেই অনুযায়ী চাহিদাটা নির্দিষ্ট একটা চেহারায় হয়তো ফুটে উঠবে। এইসব চিন্তার পর প্রদ্যোত স্থির করল, একটা লটারীর টিকিট এবার সে কিনবে।

পরদিন খুশিরামের কাছ থেকেই প্রদ্যোত চুপি চুপি একটা টিকিট কিনল। সাত-আট রকমের লটারীর টিকিট ওর কাছে রয়েছে। প্রদ্যোত বিন্দুমাত্র মাথা না ঘামিয়ে যেটা কিনল, তার ফার্স্ট প্রাইজ

তিন লক্ষ টাকার। খুশিরাম হেসে বলল, "আগে বাবুদের কাছে গিয়ে, কত ভুলিয়ে ভালিয়ে টিকিস গছিয়েছি আর এখন বাবুরাই যেচে আমার কাছে আসছে টিকিস কিনতে। আমি পয়মন্ত আছি পরমান হয়ে গেছে কিনা। মিরতুনজয় আগে কোনদিন লটারী খেলে নাই, পরথম কিনল আর পাইয়ে গেল।"

শুনেই প্রদ্যোতের মনে হল, বোধ হয় আমিও পাব। আমারও তো প্রথম টিকিট কেনা আর খুশিরামের কাছ থেকেই। এরকম যোগাযোগ তো ঘটতেই পারে যে, ওর কাছ থেকে যারাই প্রথম কিনবে তারাই পাবে। এক সময় কথায় কথায় সে বিশ্বনাথকে বলল, "তুমি কার কাছ থেকে প্রথম লটারীর টিকিট কিনেছিলে?"

সেকেণ্ড পাঁচেক ভেবে বিশ্বনাথ বলল, "আমার মাসতুতো ভাইয়ের এক বন্ধুর কাছ থেকে।" তারপর কণ্ঠস্বর বদল করে, "এ পর্যন্ত ছত্রিশটা টিকিট কেটেছি পাঁচ বছরে, সব লেখা আছে আমার ডায়েরিতে।"

জ্যোতিভূষণ মনে করতে পারলেন না প্রথম কার কাছ থেকে টিকিট কেনেন, তবে খুশিরামের কাছ থেকে এবারই প্রথম কিনলেন। মঞ্জুশ্রী চৌধুরীকে খুশিরামের খোঁজ করতে দেখে প্রদ্যোত জিজ্ঞাসা করল, "ওর কাছ থেকে কিনলেই বুঝি প্রাইজ পাবেন ভেবেছেন?"

মঞ্জুশ্রী থতমত হয়ে বলল, "আমিও জানেন, তাই ভাবছিলাম। একজন পেলেই যে সবাই পাবে এমন কোন কথা নেই। কিন্তু রাধাদি বলল, ওর নাকি এমন ইন্সট্যান্স্ জানা আছে, একই লোক তিনটে ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়া টিকিট বেচেছে। কি করি বলুন তো, কিনব?"

"আপনার নিজের যা মনে হয়েছে তাই করুন, কারুর কথায় কান দেবেন না।"

মঞ্জুশ্রী হাঁফ ছেড়ে চেয়ারে ফিরে গেল। প্রদ্যোত দুদিন ধরে নানাভাবে খোঁজ নিয়ে জানল, এ অফিসে সেই একমাত্র লোক যে

জীবনে এই প্রথম লটারীর টিকিট কিনল। খেলার তারিখটা তার মুখস্তই আছে তবু চুপি চুপি শোবার ঘরের দেয়ালে, খাটে শুয়ে চোখ থেকে এক হাত দূরত্বের মধ্যে পেনসিল দিয়ে লিখে রাখল। টিকিটটা রেখেছে সে অফিসের ড্রয়ারে।

কয়েকদিন পর মৃত্যুঞ্জয় অফিসে এল। ওকে দেখে কেরানীবাবু এবং দিদিরা সোরগোল তুলল। কেউ কেউ বলল, খাইয়ে দাও একদিন। কয়েকজন পরামর্শ দিল, টাকাগুলো কি করা উচিত। একজন বলল, নিরাপদ কোন ব্যবসায়ে খাটাও। আর একজন আপত্তি করে বলল, কোন ব্যবসাই আজকাল নিরাপদ নয় বরং সেভিংস সার্টিফিকেট কিনুক। তারপর ওরা তুমুল তর্কে প্রবৃত্ত হল। অনেকে বলল, বাড়ি-জমি-সোনা ইত্যাদি কিনে রাখলে ভবিষ্যতের জন্য ভাবনা থাকবে না।

মৃত্যুঞ্জয় তার স্বভাবসুলভ বিনয় সহকারে সকলের কথাতেই ঘাড় নাড়ল। প্রদ্যোতের কাছে এসে নমস্কার করে একগাল হেসে দাঁড়াতেই প্রদ্যোত বলল, "এবার তুমি কি করবে, অনেকগুলো টাকা তো পেলে।"

"ভগবান দিয়েছেন তাই পেলাম।" মৃত্যুঞ্জয় হাতজোড় করে উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাল।

"কি করবে টাকা দিয়ে?"

"বিশ্রাম করব।"

ওর স্বাভাবিক বিনয়ী কণ্ঠকে প্রদ্যোতের যেন ইয়ার্কি মনে হল। ক্ষুণ্ণ হল সে। মৃত্যুঞ্জয় অর্থবান হলেও এখনো পিওন বটে। গম্ভীর হয়ে প্রদ্যোত বলল, "কতদিন বিশ্রাম নেবে?"

"আমার তো সংসার খরচ সামান্যই। যদি টেনেটুনে চলি তা হলে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারব। আপনার কি মনে হয়, পারব না?" মৃত্যুঞ্জয় উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

"তুমি কি চাকরি করবে না আর?"

"না। ছেড়ে দোব। শুধু দুবেলা দুমুঠো খাব,আর ঘুমোব। আমার শুয়ে থাকতে খুব ভাল লাগে। এবার থেকে শুধু ইচ্ছে হলে কাজ করব। বুঝলেন প্রদ্যোতবাবু, এই টাকাটা পেয়ে আমার মনে হল, এত খাটাখাটুনি যে জন্য সেটাই যখন ভগবান পাইয়ে দিলেন, তখন আবার কেন খাটা ?"

প্রদ্যোত শুধু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে শুনে যাচ্ছে। শুনতে শুনতে সে অনুভব করল ক্লান্ত লাগছে। ক্লান্তিটা ক্রমশ তাকে দীনতায় ডুবিয়ে দিচ্ছে। এই প্রথম সে ঈর্ষা করতে শুরু করেছে মৃত্যুঞ্জয়কে অতগুলো টাকা পাওয়ার জন্য। এখন তার মনে হচ্ছে, এতদিন ধরে রুটিনমাফিক, যন্ত্রের মত শুধু খেটেই চলেছি। আরও অনেক বছর ধরে তাকে খেটেই যেতে হবে। অথচ এই লোকটা কেমন রেহাই পেয়ে গেল।

মৃত্যুঞ্জয় চলে যাবার পর প্রদ্যোত কলম রেখে দিল। পিছন থেকে বিশ্বনাথ চাপা গলায় বলল, "ওর কাছে বিনা সুদে যদি হাজার পাঁচেক টাকা ধার চাই, প্রদ্যোতদা তাহলে রিফিউজ করার মত মর‍্যাল গ্রাউনড কি ওর থাকতে পারে ?"

জ্যোতিভূষণ বললেন, "ধরাকে এখনই সরা জ্ঞান করতে শুরু করেছে। চাকরি ছেড়ে দেবো ! বললেই হল !"

ছুটির পর রাস্তায় বেরিয়ে ট্রাম-বাসের দিকে তাকিয়ে প্রদ্যোত ক্লান্ত বোধ করল। যেদিকেই সে তাকায় শুধু বিশ্রাম লোলুপতার এবং বিরক্তির ঊর্ধ্বশ্বাস গমনাগমন চোখে পড়ল। যত শব্দ তার কানে এল তাতে কর্কশ দীর্ঘশ্বাসের এবং হতাশ গর্জনের নিরন্তর ওঠা-নামাই শুধু শুনল। হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে বাড়ি পৌছল। ছেলেকে অঙ্ক বোঝাবার সময় প্রদ্যোত ক্লান্ত বোধ করল। রাত্রে স্ত্রীর পাশে শুয়ে তার মনে হল একমাত্র নিঃসঙ্গতা ছাড়া বিশ্রাম বোধ হয় পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু নিঃসঙ্গ হবার জন্য কতকগুলো জিনিস দরকার, তার মধ্যে প্রধান জিনিস টাকা। বহু টাকা যা দৈনন্দিন

নানাবিধ দায় ও ভবিষ্যতের সর্তসমূহ পালনের আবশ্যিকতা থেকে রেহাই দেবে। এবং প্রচুর টাকা, একমাত্র লটারি ছাড়া আর কোন উপায়ে অর্জনের সুযোগ তার নেই।

প্রদ্যোত গভীরভাবে প্রথম পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষায় ডুবে গিয়ে, ঘুমে পাওয়া স্ত্রীকে বলল, "লটারির একটা টিকিট কাটলুম।"

"কত টাকার?"

"কিসের টাকা?"

"ফার্স্ট প্রাইজ কত?"

"তিন লাখ।"

"অ—নেক টাকা তো।" এই বলে স্ত্রী ওপাশ ফিরে শরীর 'দ' করে শুল। প্রদ্যোত কিছুটা উৎসাহব্যঞ্জক স্বরেই বলল, "তাহলে চাকরি ছেড়ে দেব।"

"তার মানে!" বিস্ময়ের আঘাতে 'দ' ভেঙে পূর্ণচ্ছেদ হয়ে গেল।

"স্রেফ পড়ে পড়ে ঘুমোব আর ইচ্ছে হলে কাজ করব। টাকা রোজগারের জন্যেইতো খাটাখাটুনি, সেটাই যদি পেয়ে যাই তাহলে আর চাকরি করব কেন?"

"তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সেজন্য এমন চাকরীটা ছেড়ে দেবে? এখনো কত টাকা রিটায়ার করা পর্যন্ত রোজগার করবে জান?"

প্রদ্যোত মনে মনে দ্রুত গুণ করল—৬১৫ × ১২ × ১১ অর্থাৎ একাশি হাজার টাকারও বেশি। এর উপর বোনাস, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড এবং গ্র্যাচুইটি। সোয়া লাখ টাকারও বেশি হয়ে যাচ্ছে।

"অতগুলো টাকা ছেড়ে দেবে, শুধু শুধু?"

"কিন্তু আমার ভীষণ ক্লান্ত লাগছে যে।" প্রদ্যোত ম্রিয়মান কণ্ঠে বিরক্ত উত্তেজিত স্ত্রীকে প্রশমিত করার চেষ্টা করল।

"ক্লান্ত! তাহলে লক্ষ লক্ষ লোক আপিসে চাকরী করছে কি করে?"

তারাও ক্লান্ত, এই কথাটি বলার ইচ্ছা দমন করে প্রদ্যোত অতঃপর ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন অফিসে গিয়ে সে প্রবল চাঞ্চল্য দেখল। মৃত্যুঞ্জয় চাকরী ছেড়ে দিয়েছে। কেউ বলল, ইডিয়ট। কেউ বলল, হয়তো ব্যবসায় নামছে। বেশির ভাগই বলল চাকরিটা ছাড়ার কোন মানে হয় না। চাকরি হল সিকিউরিটি, এই বাজারে জিনিসটার দাম আছে। কিন্তু সকলের মুখেই কেমন একটা অস্বস্তিকর বিভ্রান্তির ছাপ পড়েছে।

প্রদ্যোত হিসেব করে দেখল, চল্লিশ হাজার টাকার লটারি পেয়ে মৃত্যুঞ্জয় পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি টাকা দামের চাকরিটা ছেড়ে দিল। ওকে অসাধারণ সাহসী মনে করতে এখন তার অসুবিধা হচ্ছেনা। বিছানায় চিৎ হয়ে বুকের উপর হাতদুটি জড়ো করে মৃত্যুঞ্জয় জানলা দিয়ে বাইরের আকাশে তাকিয়ে,—এইরকম একটা ছবি প্রদ্যোতের চোখের সামনে কয়েকবার ভেসে উঠতেই সে ধীরে ধীরে ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে শুরু করল এবং লটারির ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়ার কামনার দ্বারা প্রবলভাবে আক্রান্ত হল। তখন তার ইচ্ছা করল মৃত্যুঞ্জয়ের মত সাহস দেখাতে, এই মুহূর্তে চাকরি ছেড়ে দিতে।

সেদিন রাতে সে স্ত্রীকে বলল, "ছেড়েই দেব চাকরিটা যদি লটারির টাকা পাই।"

"ছেড়ে দিয়ে কি করবে?" কটু কণ্ঠে স্ত্রী জানতে চাইল।

"কিছুই করব না। সেইজন্যই তো ছাড়ব। শুধু শুয়ে থাকব, ঘুমোব, বই পড়ব আর খিদে পেলে খাব।"

"ওইভাবে দিন কাটাতে পারবে? একঘেঁয়ে বিরক্তিকর লাগবেনা?"

প্রদ্যোত কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "এখনকার এই একঘেঁয়েমীর থেকে ক্লান্তিকর আর কিছু হতে পারে না।"

"কিন্তু চাকরি থেকে যে টাকাগুলো পেতে পার অযথা সেগুলো

ছেড়ে দেওয়া কি বোকামি হবে না? ওই টাকা দিয়ে তো আরো বেশী সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়ান যেতে পারে?”

প্রদ্যোত চুপ করে রইল। সে জানে, কথা বাড়ালে বহু প্রকারের অকাট্য যুক্তি তার সামনে পাঁচিল তুলে দাঁড়াবে। সেগুলো লঙ্ঘন করা বা ধ্বসিয়ে দেওয়াও আর এক ক্লান্তিকর কাজ। আসলে মনের ইচ্ছাটি এত আগে ব্যক্ত করাই তার ভুল হয়েছে। লটারির টাকা পেয়েই চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে তারপর চুপচাপ সবরকম কথা শুনে যাওয়াই ভাল। সবাই কিছুদিন খুব বোকা বলবে তারপর এক সময় চুপ করে যাবে। তারপর ভুলে যাবে।

পরদিন থেকে সে গুণতে শুরু করল লটারির খেলার তারিখটা ঘনিয়ে আসতে কত বাকি। এক একটি দিন যায় আর সে বর্ধিত হারে চঞ্চলতা বোধ করতে শুরু করে। চটপট বাজার করে, ছেলেকে বারবার একই পড়া বুঝিয়ে দিতে দিতে বিরক্ত হয় না, বাসে বা ট্রামে ভীড় থাকলেও ঠেলেঠুলে উঠে পড়ে, বেয়ারার জন্য অপেক্ষা না করে নিজেই জরুরি ফাইল অফিসারের কাছে পৌঁছে দেয়, পঞ্চমবার মা হওয়া মিসেস চক্রবর্তীকে নিয়ে মেয়েরা মসকরা করলে প্রদ্যোতও এখন মুচকি হাসে, দিন দুয়েক অফিস গেটে ছুটির পর সে শ্লোগানও দিয়েছে “মালিকের দালাল নিপাত যাক” বলে আর প্রতি রাতে ঘরের আলো নেভাবার আগে দেয়ালে একটা নতুন টিক্ দেয় পেন্সিলের। কিছুক্ষণ মাছের কাঁটার মত টিক্‌গুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে প্রবল উদ্দীপনায় অভিভূত হয়ে সে আবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়—পেলেই চাকরিটা ছেড়ে দেব।

অবশেষে দিনটি এসে গেল। প্রদ্যোত বিছানা থেকে উঠল না, বাজার গেল না, অফিসেও না এবং খবরের কাগজ ছুঁল না। স্ত্রী একবার বলেছিল আজ একটা লটারির রেজাল্ট বেরিয়েছে, এটা তুমি কিনেছিলে নাকি? প্রদ্যোত মাথা নাড়ল উপরন্তু বেশ জোর দিয়েই বলল “না।”

দুপুরে বিছানায় চিৎ হয়ে হাত দুটো বুকের উপর রেখে জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কাটাল। এই সময় কারুর কোন প্রশ্নের জবাব দিতে তার ইচ্ছা করল না। কোনপ্রকার ভালমন্দ সুখ দুঃখ বোধ তার হৃদয়ে পৌঁছল না। গভীর রাত্রে ঘর থেকে বেরিয়ে দালানের আলোটি জ্বেলে সে খবরের কাগজ খুলল। প্রায় আধ পাতা জুড়ে রেজাল্ট ছাপা রয়েছে। প্রথমে সে তলার দিকের নম্বরগুলোয় চোখ রাখল। এগুলো একশো টাকা পাওয়াদের নম্বর। প্রদ্যোত নিজের নম্বর পেল না। তারপর একটু উপরে পাঁচশো টাকা পাওয়াদের নম্বরগুলো খুঁটিয়ে দেখেও যখন পেল না, উত্তেজনায় তার হাতটা কেঁপে উঠল। সে হাজার টাকার নম্বরেও পেল না। দশ হাজার পেয়েছে যে তিনটি নম্বর তার সঙ্গে নিজের সিরিয়ালেরই মিল নেই। পঞ্চাশ হাজারের দুটি এবং তিন লাখের একটি নম্বর এবার বাকি। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ রেখে হঠাৎ সে নিজেকে ভাগ্যের মুখে ঠেলে দিল।

পরদিন প্রদ্যোত অফিসে কাজ করতে করতে লক্ষ করল, বিশ্বনাথ তালগোল পাকান একটা লটারীর টিকিট মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলেছে। জ্যোতিভূষণ তাই দেখে মৃদু হাসল মাত্র। বিশ্বনাথ বিড়বিড় করে বলল, "লাক একবারই আসে। আর পয়সা নষ্ট করব না।" মঞ্জুশ্রী চৌধুরী একসময় বলল, "ধ্যেৎ প্রদ্যোতবাবুর সঙ্গে পরামর্শ না করলেই হত। রাধাদির কথামতই এবার কিনব।"

ছুটির কিছু আগে খুশিরাম অনেকরকম লটারির টিকিট নিয়ে বিক্রি করতে করতে প্রদ্যোতের কাছেও এল। "কিনুন এই দু-লাখেরটা। আর পনেরো দিন পরে ড্রোয়িং হোচ্ছে।"

প্রদ্যোত কয়েক মুহূর্ত ভেবে উত্তেজনা চেপে বলল, "ওটা বড্ড অল্পদিনের জন্য। দু-তিন মাস পর ড্রয়িং হবে এমন কিছু থাকে তো দাও।"

পাষাণভার

ধর্মতলার মোড়ের স্টপটা তুলে দেওয়ায় অনিলের মতো অনেকেই এখন চলন্ত ট্রাম থেকে লাফিয়ে নামে। লাল আলো থাকলে অবশ্য ট্রামকে দাঁড়াতেই হয়, তখন লাফানোর দরকার হয়না। বহুদিনই অনিল ভেবেছে, দরকার কি এইভাবে নামার মোড়টা পার হলেই তো টার্মিনাস। পঞ্চাশ-ষাট মিটার পথ বাঁচাবার জন্য নিজেকে মৃত্যু-সম্ভাবনার সম্মুখীন করা কেন! দুচার দিন সে নামলও ধর্মতলা টার্মিনাসে ট্রাম থামার পর। কিন্তু অন্যান্যদের টপাটপ নামা দেখে আর নিজেকে সামলাতে পারে না। শুধু মনে হয়, আবার এতটা পথ হেঁটে ফিরব! পঞ্চাশ-ষাট মিটার অর্থাৎ এক মিনিট দেরি করার ধৈর্যও অনিলের নেই।

সেদিন ট্রামটা ধর্মতলার মোড়ের কাছাকাছি, কিন্তু সবুজ আলো জ্বলছে। একটা লোক নামার অপেক্ষায়। লোকটাকে মাসে অন্তত বারো-তেরোদিন অনিল ট্রামে দেখে। কাছাকাছিই কোথাও চাকরি করে, হয়তো ইলেকট্রিক বা ইনকাম ট্যাক্স বা এল-আই-সি অফিস বা কোনো দোকান-টোকানে। তার পাশে আর একটা লোক, হাতে জীর্ণ একটা ফোলিও, ট্রাউজারসটা ঢলঢলে, গায়ে ঘেমো গন্ধ, নামার জন্য ইতিউতি পথের দুধারে তাকাচ্ছে। বোঝা যায় ভরসা পাচ্ছে না। অনিল বিরক্ত স্বরে বলল, "নামবেন যদি নামুন, নয়তো সরে দাঁড়ান।"

"হ্যাঁ নামি।" লোকটি ব্যস্ত হয়ে নামামাত্র পিছলে তালগোল পাকিয়ে গেল। পিছনেই একটা ডবল-ডেকার বাস আসছে। ঘাড়

ফিরিয়ে অনিল দেখল বাসের একটা চাকা লোকটার পিঠের উপর উঠছে।

"কি কথাই বললেন দাদা!" অনিল চমকে দেখল তার সামনের লোকটি, যার সঙ্গে মাসে অন্তত বারো-তেরো দিন ট্রামে দেখা হয়, কথাটা বলল। অনিল তৎক্ষণাৎ টুক্ করে চলন্ত ট্রাম থেকে নেমে ধর্মতলার ভীড়ে মিশে গেল।

সারাদিন অনিল কাজে মন বসাতে পারল না। লোকটি তার কথাতেই নেমে বাস-চাপা পড়ল। হয়তো মরে গেছে। বাসের চাকায় কতটা ওজন থাকতে পারে তাই নিয়ে সহকর্মীদের সঙ্গে বহুক্ষণ আলোচনা করল। বাসের নিজস্ব ওজন এবং অন্তত একশো যাত্রীর ওজন মোটামুটি হিসেব করে একজন জানালেন, কম করে আড়াইশো মন। অনিল নিশ্চিত হয়ে গেল, লোকটি আর বেঁচে নেই। এই মৃত্যুর জন্য পরোক্ষভাবে সেই যে দায়ী তা আর কেউ না জানলেও...অনিল ভাবতে ভাবতে থমকে গেল। আর সেই লোকটি জেনে গেছে। শুধুই কি জানা, অভিযোগ পর্যন্ত করেছে—"কি কথাই বললেন দাদা!"

সুতরাং দুটি চিন্তায় অনিল কাতর হয়ে পড়ল। একটা মৃত্যু সে ঘটিয়েছে অতএব সে অপরাধী। মুস্কিলের কথা, ব্যাপারটা সে মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না। যতই ভাবে ততই নিজেকে খুনী বলে মনে হচ্ছে। অন্যটি—তার এই অপরাধের একজন সাক্ষী রয়ে গেছে। হয়তো লোকটির সঙ্গে আর জীবনে সাক্ষাতই হবেনা, কারণ অনিল ইতিমধ্যেই ঠিক করে ফেলেছে ধর্মতলা স্ট্রীটের কোনো ট্রামেই আর জীবনে উঠবে না। কিন্তু সবসময় কি মনে হবেনা একটা লোক তাকে ফাঁস করে দিতে পারে? একটা পাষাণভার কি সর্বদা বুকের মধ্যে থেকে যাবে না?

এই দুটি চিন্তা এমনই জাঁকিয়ে বসল যে, সে ভবে দেখল একমাত্র আত্মহত্যা ছাড়া রেহাইয়ের কোন পথ নেই। আর নয়তো অপরাধ

কবুল করে শাস্তি নেওয়া। অনিল লেখাপড়া জানা, বি. এ. পাশ। বয়স সাঁইত্রিশ, অবিবাহিত এবং বোধহয় বিবাহ করবে না। বছর পনেরো আগে একটি মেয়েকে মনে মনে প্রেম দেওয়া এবং মেয়েটির বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর চাকরীর দরখাস্ত এবং ইণ্টারভ্যু দেওয়া—এই দুটি কাজ ছাড়া এ পর্যন্ত উদ্যোগী হয়ে সে আর কিছু করে নি।

সমাধানের দুটি উপায় অর্থাৎ আত্মহত্যা নয়তো কবুল। এর প্রত্যেকটিই অনিল যাচাই করল অফিস ছুটির পর গড়ের মাঠের ঘাসে চিৎ হয়ে শুয়ে। প্রথমে চিন্তা করল আত্মহত্যা প্রসঙ্গ—যদি মরে যাই তাহলে কেউ কি কোনভাবে উপকৃত হবে? লোকটি কি বেঁচে উঠবে? তার পরিবারবর্গ, নিশ্চয়ই বৌ-ছেলেমেয়ে আছে, তারা কি উপকৃত হবে? হওয়ার কোনো কারণ অনিল খুঁজে পেল না। বরং দ্বিতীয় উপায়টাই ভাল ঠেকল তার কাছে। কবুল করলে পাষাণভারটা মন থেকে নেমে যাবে, যা শাস্তি দেবে তাইতে প্রায়শ্চিত্তও হয়ে যাবে।

সন্ধ্যা উতরে রাত অনেক এগিয়ে গেছে। অনিল দুর্ঘটনার স্থানটিতে হাজির হল। ভেবেছিল রাস্তায় থকথকে রক্ত দেখবে। দেখল কিছুই নেই শুকনো খটখটে। ফুটপাথের কলমসারাই-ওয়ালাকে সে জিজ্ঞাসা করল, "সকালে এখানে একটা অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছিল না?"

"কখন?"

"এই দশটা নাগাদ।"

"বাস চাপা?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ। কি হল লোকটার?"

"সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল। অ্যাম্বুলেন্স এল, পুলিশ এল। ড্রাই-ভারটাকে পাবলিক খুব মারল সেও হাসপাতালে গেল।"

অনিলের আর শোনার স্পৃহা রইল না। অপরাধের বোঝা আরো বাড়াল বাসের ড্রাইভারটা। বেচারার মার খাওয়ার, কতটা

খেয়েছে কে জানে, মূল কারণ কেউ না জানলে কি হবে, তাতে পাষাণভার যে আরো বেড়ে গেল, অনিল ক্রমশ অনুভব করছে।

"পুলিশ কি করল ?"

"কি আর করবে। কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করল, আমাকেও। বললুম, চলন্ত ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে পড়ে গেল, বাসটা আসছিল, ব্রেককষার আগেই চাপা গেল।"

"আপনি ওকে ট্রাম থেকে নামতে দেখেছিলেন ?"

"আরে মশাই অতশত···" কথা শেষ না করে কলমসারাইওয়ালা আগন্তুক খদ্দেরে মন দিল।

অনিল ভাবল, একটি নিহত ও একটি আহত হওয়ার পিছনে আমারই অবিমৃষ্যকারিতা রয়েছে। এর জন্য শাস্তি না নিলে সারা-জীবনই দগ্ধে মরতে হবে। হয়তো কবুল করলে, সকাল দশটার আগে মনের যে ওজন ছিল তা ফিরে পাওয়া যাবে। সুতরাং এখুনি থানায় যাওয়া দরকার।

থানায় ঢুকেই সামনের টেবিলে মোটা একটা খাতা নিয়ে যে লোকটি বসে অনিল তাকেই জিজ্ঞাসা করল, "সকালে ধর্মতলার মোড়ে যে লোকটি বাস চাপা পড়েছে সে কি মারা গেছে ?"

"কেন ?"

"আমি তার ঠিকানাটা চাই।"

"কেন ?"

"দরকার, মানে তার বাড়িতে যেতে চাই। কিছু বলার আছে।"

"তাহলে বাড়ির ঠিকানা কেন, স্বর্গের ঠিকানা দিতে হয়।"

"মারা গেছেন!" অনিল ব্যাপারটা পাকাপোক্তভাবে জেনে বিমর্ষ কণ্ঠে বিড়বিড়িয়ে বলল, "ইস আমার জন্যই মারা গেলেন।"

শোনামাত্র পুলিশটি লাফিয়ে উঠে তার বড়বাবুর ঘরে অনিলকে নিয়ে গেল।

"স্যার, আজ সকালের অ্যাক্সিডেন্টটার জন্য ইনিই দায়ী।"

"কোনটে ?"

"বাসচাপার-টা।" চেয়ারটায় বসা উচিত হবে কি না ঠিক করতে না পেরে অনিল দাঁড়িয়েই বলল, "ওঁকে ট্রাম থেকে নামার জন্য আমি তাড়া দিতেই ব্যস্ত হয়ে নামতে গিয়ে এই কাণ্ড ঘটল। যদি তাড়া না দিতুম তাহলে উনি নামতেন না, মারাও যেতেন না।"

বড়বাবু কিছুক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে খুব বিরক্ত হয়েই বললেন, "এই আপনাদের দোষ। একটুও ধৈর্য ধরতে পারেন না। কেন, তাড়া দেবার কি ছিল ? যদি এক মিনিট কি পাঁচ মিনিটও দেরি হয় তাতেই বা কি এমন ক্ষতি হত ? একটা লোকের প্রাণ তাহলে বাঁচত। যান, আর কখনো এমন করবেন না। ধৈর্য ধরতে শিখুন।"

"কিন্তু স্যার, আমি এজন্য শাস্তি নিতে প্রস্তুত। আপনি আমাকে জেলে দিন।"

"আমি কি জেল দেবার মালিক ? হাকিম দেবে। সেজন্য মামলা তৈরী করতে হবে, সাক্ষী-সাবুদ-প্রমাণ লাগবে, সে অনেক হাঙ্গামা ঝামেলা। বরং ওই যা বললুম, এবার থেকে ধৈর্য ধরে চলতে শিখুন। ভবিষ্যতে যেন আর যেন কেউ আপনার জন্যে না মরে, কেমন ?"

অনিল বুঝল এ লোকটিকে ব্যাপারটির গুরুত্ব ঠিক বোঝান যাবে না। হয় এ ফাঁকিবাজ নয়তো তাকে বিকৃতমস্তিষ্ক ঠাউরেছে। তার পাষাণভার হাল্কা করতে এরা কোন সাহায্যই করবে না। অনিল ভেবে দেখল বরং মৃত লোকটির বাড়িতে গিয়ে তার ছেলে-বৌ বা নিকটস্থ আত্মীয়দের কাছে কবুল করাই ভালো। তারা উত্তেজিত হয়ে নিশ্চয়ই শাস্তির ব্যবস্থা করবে। মৃতের ঠিকানা চাইতেই পাওয়া গেল, অবশ্য অনিলের ঠিকানা এবং যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্যও থানা লিখে রাখল।

হাঁটতে হাঁটতে অনিল ভাবল, বোধ হয় বাড়াবাড়ি হচ্ছে। নামতে বললেই অমন বিপজ্জনকভাবে কি কেউ নামে ? নিশ্চয় লোকটিরও দোষ ছিল। আমি শুধু নিমিত্তের ভাগী মাত্র। অন্য লোক হলে কি, বলামাত্র নামত ? নিশ্চয় না। অনিল নিজে

যে নামত না, তাতে সে নিশ্চিত। এখন তার প্রধান ভাবনা—কেন যাচ্ছি এবং না গেলেই বা কী হয়?

অনিল তখন একটা সিনেমা-বাড়ির সামনে এসে পড়েছে। শস্তার টিকিট পাওয়া যাচ্ছে দেখে, চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেতে ঢুকে পড়ল। ছবিতে একটা ব্যাপারে তার মজা লাগল, একই গায়ক তিনজনের বকলমে গান গাইছে। অন্তত তিনজন গায়ককে নিযুক্ত করা উচিত, এইটাই তার মনে হল।

ছবি দেখে বেরিয়ে মিনিট দশেক হাঁটার পর তার মনে হল মৃত লোকটির বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে। পাষাণভারটা খুব বেশি আর ঠেকছে না, বোধ হয় ছবি দেখার ফলেই নেমে গেছে। ভাবল, তবু এত কাছে যখন এসে গেছি বাড়িটার সামনে দিয়ে একবার ঘুরে যাই। আবার ভাবল, না গেলেই বা কি হয়? এই ধরণের টানা পোড়েন মিনিট ছু'য়েক তার মধ্যে চলল। শেষে ঠিক করলো ব্যাপারটা আজকেই চুকিয়ে দেওয়া ভালো। পরে ঘটনাটা মনে পড়বেই তখন দগ্ধে মরতে হবে। বরং কৃতকর্মের ফলাফলটা চাক্ষুষ দেখে রাখলে দগ্ধানির মাত্রা ঠিক থাকবে। হয়তো লোকটির এমন কেউ নেই যে বিপন্ন হয়ে পড়বে, হয়তো ভীষণ একটা পাজি লোক যার মৃত্যুতে অন্যে উপকৃত হল, এসব তথ্য জানা থাকলে অনুতাপ নাও হতে পারে।

এই ধরণের যুক্তির বশবর্তী হয়ে অনিল মৃত লোকটির বাড়ির সামনে উপস্থিত হল। কিছু লোক রকে গম্ভীর মুখে বসে। অনিল তাদের কাছে গিয়ে বলল, "এখনো আসেনি?"

"না, মর্গ থেকে ছাড়তে দেরি করছে।" একজন বলল। আর-একজন বলল, "দেরি তো হবেই। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই মনে হয় এসে পড়বে।"

ভিতর থেকে ক্ষীণ কান্নার আওয়াজ আসছে। কণ্ঠস্বর যথোচিত বিষণ্ণ ও বিস্মিত করে অনিল বলল, "ইস, জ্বলজ্যান্ত মানুষটা।

আজ সকালেও দেখা হল, অফিস যাবার পথে, ব্যাপারটা ঘটার প্রায় পাঁচমিনিট আগেই।"

"নিয়তি আর কাকে বলে। কাল রাতেই আমায় বলল, দাদা গোটা পঞ্চাশেক টাকা ধার দাও। বললুম আজ হাতে নেই কাল নিও। প্রায়ই নেয়, ঠিক শোধও দেয়। বড় সৎ লোক ছিল। প্রায় কুড়ি বছর ধরে দেখছি তো। আটটা ছেলেমেয়ের সংসার, কুলোয় তো আর না। আজ সেই টাকাটাই দিলুম ওর সৎকারের জন্য।"

কেউ মাথা হেঁট করল, কেউ চুক চুক শব্দ। অনিলের মনে হল এরা পাড়ার লোক।

"তবু কিন্তু বুদ্ধি ছিল, ইনসিওরের প্রিমিয়ামটা ঠিক দিত! বলত যদি মরে যাই ছেলেমেয়েগুলো তো তবু কিছু টাকা পাবে। টো টো করে ব্যাগ হাতে ঘুরি, কখন রাস্তায় মরব তার ঠিক কি। আর দেখ সেই রাস্তাতেই মরল।"

একজন ফিস ফিস করে বলল, "ইদানীং তো সংসার আর চলছে না। ইনসিওরের টাকাটা পেলে তবু কিছু কাল চলে যাবে।"

"বৌটাও বেঁচে গেল। বাচ্চা হয়ে হয়ে শরীরের তো আর কিছু নেই।"

সবাই দীর্ঘশ্বাস ফেলার জন্য ঘাড় নামিয়েছে, অনিল সেই ফাঁকে হনহনিয়ে স্থান ত্যাগ করল। পরদিন সে অফিস যেতে ট্রামেই উঠল। ধর্মতলার মোড়ের কাছে ট্রামটা আসতেই দরজায় এসে দাঁড়াল। এক ছোকরা নামবার জন্য ঠেলেঠুলে এগোচ্ছে, বিরক্ত হয়ে অনিলকে বলল, "হয় নামুন, না হয় পথ দিন। এখানে পথ জুড়ে রয়েছেন কেন?"

অনিল একটুও নড়ল না। ছোকরা রেগে উঠল।

"আরে মশাই নামুন না।" ছোকরা অনিলকে বেশ জোরেই ঠেলা দিল। তাতে অনিল রেগে বলল, "কেন, এটা কি ট্রাম স্টপ? নামি আর গাড়ি চাপা যাই!"

ছোকরা তখন অনিলের পা মাড়িয়ে নামতে গেল। ধাক্কা দিল অনিল। এতে ছোকরাটি ঘুঁসি মারল অনিলকে। ট্রাম ততক্ষণে ধর্মতলার মোড় পার হয়ে স্টপে দাঁড়িয়েছে। ভীড় জমে গেল। দোষটা কার, এই নিয়ে তর্ক শুরু হল।

"কালকেই এখানে একজন ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে বাস চাপা পড়ে মরেছে। আমি যে ওকে নামতে দিই নি সেটা কি খুব অন্যায় করেছি?" অনিল গলা চড়িয়ে বলল।

"আমি যদি চাপা যাই তো তোমার কি?" ছোকরাও গলা চড়াল।

"আপনি মরলে আমি কি দায়ী হতাম না?"

"কেন হবেন?"

"আপনার মৃত্যু হতে পারে জেনেও বাধা দিইনি বলে।"

জনতা অনিলকে তারিফ করে নিশ্চয় নিশ্চয় বলে সমর্থন করতেই ছোকরা থতমত হল। "তা কেন, আপনি কেন দায়ী হবেন।" এই বলতে বলতে হাঁটা শুরু করছিল, অনিল হাত চেপে ধরল।

"জবাব দিন। আপনার যদি পাঁচটি ছেলেমেয়ে থাকে, আপনার রোজগারের উপরই যদি ভরসা করে থাকে সংসার, তাহলে আমি কি অপরাধী হতাম না?"

ছোকরা অধৈর্য হয়ে বলল, "না হতেন না, কারণ আমার বিয়েই হয় নি। কেউ আমার রোজগারের ভরসায়ও নেই। তা ছাড়া ওরকম ভাবে কোন লোক বলামাত্র ট্রাম থেকে নামতে পারে না যদি না আত্মহত্যার মতলব থাকে।"

জনতা সায় দিয়ে মাথা নেড়ে যে যার কাজে চলে গেল। তখন অনিল অফিস যেতে যেতে বোধ করল পাষাণভারটা একদমই নেই। তার মনে হল এজন্য ছোকরাটিকে কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত। তবে এটাও ঠিক, আমি মরলে ছোকরা সেটা আত্মহত্যা বলে নিশ্চয় চালাবে, তাহলে সেটা খুবই অন্যায় হবে।

শেষবিকেলের দুটি মুখ

হাওড়া স্টেশনের বিরাট টিনের চালার নিচে দাঁড়িয়ে দুইবোন বারবার চারধারে তাকাল। প্রতিটি মানুষের মুখ লক্ষ্য করার চেষ্টা করল। কেউই তেমন করে তাদের দেখে না, সবাই ব্যস্ত, সকলেরই কোন না কোন কাজ আছে। তাদেরও আছে।

ওরা স্টেশনের বিরাট চালার নিচে, গমগমে শব্দ ও ব্যস্ততার মধ্যে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে যাচ্চে। সারা স্টেশন জুড়ে কে কথা বলছে। দুইবোন মুখ চাওয়া-চাওরি করল। হঠাৎ কথা বন্ধ হল। ছোটবোন আঙুল দেখিয়ে বলল, "ওই যে।" ওরা দুজনে তাকাল সস্‌প্যানের মত লাউডস্পিকারটার দিকে।

ছোটবোন গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, "এখন কি করব?"

বড়বোন এধার ওধার তাকাবার ভান করে দেখে নিল একবার। দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাদা চুলের মধ্যে আঙুল চালাচ্ছে। এবার ফুঁ দিয়ে দিয়ে হাত থেকে চুল ঝেড়ে ফেলবে।

বড়বোন বলল, "চল ওই দিকটায়।"

ওরা গমগমে ভিড়ের মধ্য দিয়ে উত্তর দিকে এগোল। টিকিট ঘরের খুপরিতে মানুষের সারি, তার পাশ কাটিয়ে, ঢালাও মেঝেতে ছড়ানো মানুষ শুয়ে আর বসে, তাদের পাশ কাটিয়ে, উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে মানুষ, তাদের পাশ কাটিয়ে, দুইবোন তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্রাম ঘরে এল। একটা বেঞ্চের ধার ঘেঁষে দুজনে বসল। জানলা দিয়ে রাস্তা দেখা যায়। সার দিয়ে বাস দাঁড়িয়ে। ঘরের মধ্যে ফিকে

আলো। ভ্যাপসা গন্ধ। জলের কল। টিকিটের জন্য মেয়েদের সারি। আর অপেক্ষারত দূরের যাত্রী।

"দিদি জল খাব।"

"খেয়ে আয়।"

ছোটবোনের দিকে নজর রাখল। ঝুঁকে কল টিপে জল খাচ্ছে। বড়বোন অস্বস্তি বোধ করল। ছোটবোনের জামাটা পাঁজরার কাছে ফেঁসে গেছে। ঘটি হাতে দাঁড়ান লোকটা একদৃষ্টে কি দেখছে?

"তুফান একস্‌প্রেস আজ লেট।"

মুখ ফেরাল বড়বোন। তার পাশের মহিলাটি কথা বললেন।

"কতক্ষণ যে বসে থাকতে হবে।"

"কেউ বুঝি আসবেন?"

উনি হাসলেন। হাসতে হাসতে সারা ঘরে চোখ মেলে বললেন, "চিঠি পেলুম গতকাল পৌঁছবে। এসে ঘুরে গেছি, আসেনি।"

বড়বোন উঠে দাঁড়াল। ছোটবোনকে সে দেখতে পাচ্ছে না।

"যাবেন কোথাও, না কারুর জন্য এসেছেন?"

"না, না, আমরা যাব বলে এসেছি।"

বড়বোন কথা বাড়াল না। স্টেশনের বিরাট চালার নিচে, মানুষ আর শব্দের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে ছোটবোনকে খুঁজল। পা-পা এগিয়ে স্টেশনের বহু সদর গেটগুলির একটিতে পৌঁছল। এখান থেকে হাওড়ার ব্রিজ দেখা যায়। ওই ব্রিজটা পার হলে কলকাতা। কলকাতার একটি গলিতে তাদের বাড়ি। সেই বাড়ির একতলায় একটা ঘরে মা, দাদা, ভাই আর বোনের সঙ্গে সে থাকে। শীতের দিনে শীত আর গ্রীষ্মের দিনে গরম তাদের ঘরে থেবড়ে বসে থাকে। যত দক্ষিণের হাওয়া সব ছাদের উপর দিয়ে চলে যায়। হাওয়া যায়, মেঘ যায়, রোদ যায়, আর বিকেল যায়। গা-ধুয়ে আর বিকেলে ছাদে ওঠা হবে না।

নাক কুঁচকে গন্ধ শুঁকল। এখানে কেমন যেন একটা গন্ধ।

বাবাকে শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় দাদা একশিশি এনেছিল, অনেকটা সেই রকম। খালি শিশিটা ছোটবোন রেখে দিয়েছিল। কোথায় গেল ছোটবোন ?

* * *

'দিল্লী দেখো, আগ্রা দেখো' বলত আর হাতল ঘোরাত। কুতবমিনার, তাজমহলের ছবি, একে একে ঘুরে চলে যেত। লোকটা একঘেঁয়ে সুরে চেঁচাত আর হাতলটা একটু আস্তে ঘোরাতে বললে সর্দিটানার মত মুখ করে হাসত। স্টেশনের থামে লটকানো ছবিগুলো দেখতে দেখতে ছোটবোনের সেই লোকটাকে মনে পড়ল! একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, দিল্লী-আগ্রা সে কখনো দেখেছে কিনা। লোকটা কথার জবাব না দিয়ে, বাক্সের ফোকরে চোখ লাগানো উটকো মাথাগুলোকে, হাত দিয়ে মাছির মত তাড়াতে লেগে যায়। সেই লোকটাকে ছোটবোনের এখন মনে পড়ল। অনেকদিন পরে পাড়ায় এক নতুন বাইসকোপওলা এল। সেই লোকটা কেন আসে না, এই কথা ছোটবোন অনেক দিন অনেক রাত ভেবেছে। ভাবলেই কুতুবমিনার, তাজমহল, হাওয়াই জাহাজ আর জটায়ুর যুদ্ধ চোখের সামনে দিয়ে সারি বেঁধে চলে যায়। বিজ্ঞাপনের ছবি দেখতে দেখতে সে একেবারে গা ঘেঁষে এসেছিল বউটির। নজর পড়তে বুঝল তার দিকেই তাকিয়ে। ছবিতে ইংরেছি অক্ষর লেখা। বিড়বিড় করে সে অক্ষর পড়ে। আড়চোখে বউটির দিকে তাকায়। ওর কাপড় থেকেই মিষ্টি গন্ধটা আসছে। আস্তে আস্তে লম্বা শ্বাস টানল ছোটবোন। চকোলেট মোড়া কাগজে এমন গন্ধ থাকে।

"মোটেই অত সুন্দর নয়।"

ছোটবোন ঘাড় ফেরাল। বউটি ছবির দিকে তাকিয়ে।

"গেল পূজোয় আমরা গেছলুম। বাব্বাঃ যাতায়াতের কি কষ্ট আর হোটেলের কি চড়া রেট।"

ছোটবোনের ইচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে মিষ্টি গন্ধটা চুষে নিয়ে জমা করে রাখে বুকের মধ্যে। বলল, "সুন্দর নয় বললেন যে, ওখানে কি এমন—"

"মোটেই না। ওসব বন-বাদাড়ের ছবি, সেখানে যায় কে। তার চেয়ে বরং ওই ছবিটা, কোনারকের ছবিটা, ওখানে সত্যি দেখবার জিনিস আছে।"

"আপনি গেছেন?"

"আমার নন্দাই গেছল।"

"এখন কোথায় যাচ্ছেন?"

"রানীগঞ্জ।"

"কার কাছে যাচ্ছেন?"

এবার বউটি হাসল। ছবিতে মেয়েরা যেমন সুন্দর করে হাসে। তারপর কি একটা বলতে গিয়ে, না বলে আবার হাসল। তাই দেখে ছোটবোনও হাসল।

"সামনের বছর উনি ছুটি পেলে, কাশ্মীর বেড়াতে যাব আমরা।"

"দিদি ট্রেন সাত নম্বর থেকে ছাড়বে, তাড়াতাড়ি।"

ছুটতে ছুটতে এসে হাফপ্যাণ্ট-পরা ছেলেটি সুটকেশটা তুলে নিল। বেতের ঝুড়িটা হাতে ঝুলিয়ে বউটি বলল, আচ্ছা চলি।"

ওরা চলে যাচ্ছে। ছোটবোন গুটিগুটি এগিয়ে, কোলাপসিবল রেলিংয়ে হাত রেখে সাতনম্বর প্লাটফর্মে দাঁড়ানো ট্রেনটার দিকে তাকিয়ে রইল।

* * *

এত শব্দ তবু কিছুই শুনতে পাচ্ছেনা। থামের গা ঘেঁষে লোহার মত সে দাঁড়িয়ে। মাথায় লাল টুপি, খাকি পোশাকের লোকটা এদিক-ওদিক তাকিয়ে তার দিকেই আসছে। বড়বোন এখন কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। লোকটা চলে গেল পাশ দিয়ে। যাবার সময় একবার তাকিয়েছিল। বড়বোন ভাবল, বিশ্রামঘরে গিয়ে অপেক্ষা করাই ভাল। হয়তো ছোটবোন এখন সেখানে বসে আছে।

বেঞ্চ ভর্তি। বড়বোন দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। সেই মহিলাটি কোথা থেকে ঘুরে এলেন। বসার জায়গা না পেয়ে তার কাছে এসে বলল, "নাঃ এখনো আসেনি।"

"আসছেন কে ?"

নেহাত একটা কথা বলতে হয় তাই জিজ্ঞাসা করা, করে তাকিয়ে থাকল। আর থাকতে থাকতে সে দেখল, অতবড় চোখদুটো, যা দুটো মুখের আয়তনে মানায়, কেমন মানানসই হয়ে উঠল ; থুতনির নিচে বয়সের ভাঁজ কাঁপল।

"কে আবার, কেউ না।"

অন্যস্বরে হুবহু সেই কথা। জ্বালা করে উঠল মাথার মধ্যেটা। ন'মাসিমা দুটো টাকা দিয়ে বলেছিল, 'অত ঘন ঘন এলে আমিই বা পারি কি করে।' ঘরে তখন পাশের বাড়ির কে যেন ছিল। ফিরে আসার সময় বড়বোন ন'মাসিমাকে বলতে শুনেছিল, 'কে আবার, কেউ না।'

"তিরিশ টাকা বেশি পাবে বলে দেড়শো মাইল দূরে ছুটল চাকরি করতে। কি যে দরকার ছিল বুঝিনা। স্কুল থেকে আমি যা পাই আর ও যদি কিছু একটা জুটিয়ে নিত, তাহলে সাতটা লোকের সংসার খুব চলে যেত।"

বড়বোন মাথা নাড়ল।

"আমার কথা তো কখনো শোনেনা। আজ আট বচ্ছর দেখে আসছি। অথচ আমার টাকা বিয়ের আগে ছোঁবে না।"

"উনি কোথায় চাকরি করেন?"

"ডি. ভি. সি-তে।"

"আমার দাদা ওখানে চেষ্টা করেছিল, পায়নি।"

"সেকি, ও-ই তো কত লোককে চেষ্টা করে চাকরি করিয়ে দিয়েছে, আচ্ছা আমি জিজ্ঞেস করব। আছেন তো এখানে না. ট্রেনের সময় হয়ে গেছে?"

"না না আমার ট্রেনের সময় হয় নি, আমি থাকব।"

বড়বোন এখন আর কিছু শুনতে পাচ্ছে না, শুধু তার বুকের মধ্যের কথাটা ছাড়া,—আমি থাকব। আমি যাব না।

"আমি আর একবার বরং দেখে আসি।"

মহিলাটি চলে যাচ্ছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সে। মহিলাটি অত মানুষের মধ্যে আড়াল হয়ে গেছে। বড়বোন পিছিয়ে এল। স্টেশনের ফটকে এসে দাঁড়াল। বিকেল শেষ হয়ে আসছে। স্ট্যাণ্ডে বাসের মধ্যে অফিস ফেরত মানুষরা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে। মরচেধরা কৌটোর মত তাদের মুখ। রোদ্দুরের আঁচ লেগেছে হাওড়া-ব্রিজে। ষ্টিমার গম্ভীর ভোঁ বাজাল। পিঠকুঁজো ঠেলাওলা দুলতে দুলতে ব্রিজের চড়াইয়ে উঠছে। বাস থেকে নেমে ড্রাইভার আস্তে আস্তে আকাশে বিড়ির ধোঁয়া ছুড়তে লাগল। বিকেল শেষ হয়ে আসছে। লিলুয়ায় সরকারী আশ্রম আছে মেয়েদের। পালাতে গিয়ে যারা ধরা পড়ে পুলিশ প্রথমে ওখানে নিয়ে রাখে। 'বলবি আমরা এখানে থাকব, আমাদের বাড়ি নেই, কেউ নেই। পারবি বলতে?' বলতে বলতে দাদার মুখটা এই বিকেলের মত হয়ে গেছল।

বড়বোন আবার ষ্টেশনের চালার নিচে ফিরে এল।

*   *   *

কোলাপসিবল রেলিং ধরে ছোটবোন দেখছে ট্রেনটা চলে যাচ্ছে। ট্রেনের জানলার মুখগুলো প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে হাসছে। হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছে। এমন করে তারও চলে যেতে ইচ্ছে করল। লাইনের উপর আড়াআড়ি একটা ব্রিজ। প্ল্যাটফর্মের পাশ দিয়ে রাস্তাটা উঁচু হয়ে ব্রিজে উঠেছে। থলি হাতে তিনটি মানুষ রাস্তা দিয়ে চলেছে। ওরা যেন পাহাড়ে উঠছে। তারপর সে ভাবল, বড়বোন অপেক্ষা করছে।

বিশ্রামঘরে বড়বোনকে দেখতে না পেয়ে সে চালার নিচে ফিরে এল। ওজনযন্ত্রে এক বৃদ্ধ ওজন মাপল। তাই দেখল। বৃদ্ধ কার্ড পড়ে হন হন করে চলে গেল। তারপর বিজ্ঞাপন পড়ল। পড়তে পড়তে সে বইয়ের স্টলে পৌঁছে গেল।

"আর তিনমিনিট বাকি অথচ এখনো এসে পৌঁছল না, কি ইর্‌রেস্‌পন্সিবল্‌!"

ছোটবোন মুখ ফিরিয়ে দেখল। ছ-সাতটি ছেলেমেয়ের এক দল।

"ওর জন্য অপেক্ষা করলে, আমরাও ট্রেন মিস্‌ করব।"

"তাহলে?"

ওরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ব্যস্ত হয়ে চলে গেল। একটু পরেই, প্রায় ছুটে এল চশমা চোখে একটি মেয়ে। খুব রোগা, দেখে মনে হয় যেন ক্লাশ সেভেনে পড়ে। ওকে দেখেই ছোটবোন বুঝল এর কথাই ওই দলটা বলছিল।

"ওরা এইমাত্র চলে গেল।"

"চলে গেল!"

মেয়েটি হাতের চামড়ার ব্যাগটা খুব জোরে চেপে ধরল। চশমাটা নাকের ওপর ঠিক করে চেপে বসাল। তারপর এমনভাবে তাকাল, যেন জিজ্ঞাসা করছে এবার আমি কি করব?

"একা যেতে পারবেন না?"

"পারব না কেন, তবে ওদের সঙ্গে থাকলে বাড়ি চিনতে অসুবিধে হত না।" এই বলেই মেয়েটি বলে উঠল, "আরে!"

ছেলেটি ব্যস্ত হয়ে এল। সেই ছেলেমেয়েদের দলে ছোটবোন একেও দেখেছিল।

"আপনি কি এই আসছেন?" ছেলেটি বলল।

"হ্যাঁ, আপনি?"

"আমিও।"

"তাহলে!" ট্রেন তো ছেড়ে দিয়েছে। ইসস্, একটা মিছিলে ট্রামটা আটকে গিয়ে এই কাণ্ড হল।"

"এই প্রসেশন কবে যে বন্ধ হবে। যাকগে, এখন কি করবেন? যাওয়া তো হলনা।"

"বাড়িতে বলে এসেছি ফিরতে রাত দশটা এগারোটা হতে পারে বিয়ে বাড়ির ব্যবস্থা তো। এখন ফিরে গেলে বাড়িতে হাসাহাসি করবে।"

"চলুন ট্রেনে চেপে ব্যাণ্ডেল থেকে ঘুরে আসি।"

"কিন্তু আগে একটু কিছু খেয়ে নেবে।"

ওরা দুজনে চলে গেল। সেই সময় অতবড় স্টেশনের সব আলোগুলো জ্বলে উঠল। একটা ট্রেন এসেছে। পিলপিল করে স্টেশনে মানুষ ঢুকছে। এত মানুষ দেখতে ছোটবোনের ভাল লাগল না। আবার সে বিশ্রামঘরে ফিরে এল।

* * *

ছোটভাইকে মা চড় মেরে বলেছিল, 'মুখপোড়া আর একটু আগে যেতে পারিস নি?' কাদের বাড়ি বৌভাতে বিনা নিমন্ত্রণে খেতে

গিয়ে মার খেয়ে এসেছে। দিদিদের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে হাউ হাউ করে উঠেছিল। তখন এমনি ভাবে ছোটভাইয়ের মুখটা চ্যাপ্টা দেখাচ্ছিল।

ছবিগুলোর আর একটু কাছে বড়বোন এগিয়ে এল। যারা রেলে কাটা পড়েছে তাদের ছবি। কাচের উপর তার নিজের মুখের ছায়া পড়েছে। নিজের মুখ দেখার জন্য একটু পিছিয়ে কোনাচে হয়ে তাকাতেই তার মনে হল, কি বিশ্রি, কি ভয়ংকর। দাদা চীৎকার করে একদিন বলেছিল, 'আমি কি করব, কি করব। চেষ্টা তো করছি।' বড়বোন সারা কাচ জুড়ে দাদার মুখ দেখল। ওর মন মমতায় দুঃখে টলমলিয়ে উঠল। রেলে কাটা-পড়াদের জন্য সে দুঃখ পেল।

সেই মহিলাটিকে দেখতে পেল বড়বোন। পুরুষটির হাতে সুটকেশ বেডিং। ওরা কথা বলছেনা। বড়বোন ছুটে গিয়ে মহিলাটির হাত ধরল।

"উনিই কি ?"

মহিলা ঘাড় নাড়ল।

"ওর ঠিকানাটা দিন, দাদাকে পাঠাব।"

এই কথা বলে বড়বোন তাকিয়ে থাকল আর থাকতে থাকতে দেখল, দুটো মুখের আয়তনে মানায় এমন একজোড়া চোখ, ঝুলেপড়া চিবুক, আর উনুন ভাঙা মাটির মত ঠোঁট।

"ওখানে ছাঁটাই নোটিশ দেওয়া হয়েছে।"

মহিলাটির চলে যাওয়া দেখল বড়বোন। কাঁধে কেউ যেন বেডিং-সুটকেশ চাপিয়ে দিয়েছে। দেখতে দেখতে বড়বোনের ঝিমুনি এল। চোখের পাতা ভার-ভার বোধ হল। কোন রকমে চারধারে চোখ ফেলে সে ভাবল, ছোটবোন বোধহয় অপেক্ষা করছে।

বিশ্রামঘরে ফিরে এসে বড়বোন দেখতে পেল, ছোটবোনকে।

ওরা দু-জন পাশাপাশি চুপ করেবসে রইল। একসময় বড়বোন বলল, "এখানে বসে কি লাভ, চল ওদিকে যাই।"

ওরা আস্তে হেঁটে স্টেশনের আরেক প্রান্তে এল। ছোটবোন বলল, "এবার আমরা কি করব?"

বড়বোন দাঁড়িয়ে ভাবল। ভেবে বলল, "এখানে একটু দাঁড়াই।"

রেস্টুরেণ্টের দরজা ঠেলে একজোড়া ছেলেমেয়ে বেরোল। ছোট বোন দেখে ভাবল, ওরা এবার বেড়াতে যাবে।

থুথু ফেলল, কাশল। পিঠ কুঁজো করে সে ওয়াক তুলল। বড়বোন পিঠে হাত রাখল। বুকের কাছে টেনে আনল।

বলল, "কিছু বলছিস?"

"না।"

"তোর খিদে পেয়েছে?"

"না।"

আবার রেস্টুরেণ্টের দরজা খুলল। শব্দটা শুনল, শুনে ঝিমোতে শুরু করল। ট্রেনের ভেঁপু বাজল। ছোটবোন বলল, "শাঁখের মত শব্দ, না?"

"হ্যাঁ।"

"দিদি মনে আছে তোর, বাবার সঙ্গে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়ে একটা ইঞ্জিনে উঠেছিলুম!"

"হ্যাঁ।"

"ড্রাইভারের একটা দাঁত সোনার ছিল। আমায় কোলে করেছিল।"

"সে যখন ইঞ্জিনের সিটি বাজাচ্ছিল, তুই ভয়ে ওর বুকে মুখ লুকিয়েছিলি।"

ছোটবোন হাসল।

বড়বোন বলল, "ওই ছ্যাখ।"

বিয়ে করে বউকে নিয়ে বর বাড়ি চলেছে। নতুন ট্রাঙ্ক, নতুন শয্যা, নতুন গহনা, নতুন কাপড়। জড়োসড়ো হয়ে বউটি হাঁটছে। বর সিগারেটে ফুক ফুক করে টান দিচ্ছে।

"দিদি চুল দেখেছিস, সামনেটা পাতলা।"

"হ্যাঁ।"

"বরটার কিন্তু অনেক বয়েস।"

"হ্যাঁ।"

"দাদার সেই বন্ধু আর এল না কেন রে?"

"কি জানি।"

"খুব সুন্দর করে কথা বলত।"

বড়বোন আর জবাব দিল না।

"একদিন চকলেট এনে দিয়েছিল, মনে আছে?" জবাব না পেয়েও ছোটবোন থামল না, "মা বলেছিল তোকে বোধহয় পছন্দ হয়েছে।"

"চুপ কর এখন।"

ছোটবোনের চোখ ছলছল করে উঠল। কাশির ধমক চাপতে সে কুঁজো হল। মৃদু স্বরে বলল, "জল খাব।"

"খেয়ে আয়।"

ছোটবোন গেল না। বড়বোনের যেন ঝিমুনি লেগেছে। একদৃষ্টে সামনের দিকে তাকিয়ে। তাই লক্ষ্য করে ছোটবোন বলল, "এবার আমরা কি করব?"

"জানি না।"

"দাদা কি বলে দিয়েছিল?"

বড়বোন ভাবতে চেষ্টা করল।

"ওরা কি এবার আসবে?"

"কেন?"

"তাহলে আমরা এসেছি কি জন্য?"

বড়বোন চোখ মেলে চারধারে তাকাল। মানুষ, আলো, শব্দ দেখেশুনে, আবার একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। তারপর ঝিমানো সুরে বলল, "আমরা অপেক্ষা করব। ওরা আসবে, জিজ্ঞেস করবে

সঙ্গে কে আছে, কোথায় যাবে, কেন যাবে। আমরা বলব, আমরা দুবোন বেরিয়েছি বোম্বাই যাব, সঙ্গে কেউ নেই, ওখানে সিনেমায় নামব। তখন ওরা আমাদের ধরে নিয়ে যাবে। ঠিকানা জিজ্ঞাসা করবে। আমরা বলব না। তখন ওরা আশ্রমে পাঠিয়ে দেবে।"

"সেখানে কি করবে ?"

"জানি না।"

"দিদি চল পালিয়ে যাই।"

একটু একটু করে বড়বোনের ঝিমোন ভাবটা কেটে গেল। ঠাণ্ডা স্বরে বলল, "কোথায় পালাব ?"

"যেখানে হোক।"

"তারপর ?"

ছোটবোন শুধু তাকিয়েই রইল। বড়বোন হাত বাড়িয়ে ওকে বুকের কাছে টেনে আনল। মুখ নামিয়ে বলল, "ভয় পেয়েছিস ?" ছোটবোন বুকে মুখ গুঁজে থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। ওর পিঠে হাত রেখে বড়বোন নিজেকে সিধে করে রাখল।

তখন একজন ভাবল, মানুষের মুখ মরচেধরা টিনের কৌটোর মতো।

আর একজন দেখল, হাসতে হাসতে ট্রেনের মুখ চলে যাচ্ছে।

একটী পিকনিকের অপমৃত্যু

কথায় কথায় চিত্রা বলেছিল, তার প্রেমিক অরুণ সাহাদের গ্রামের বাড়িটা বাগান-পুকুর সমেত বিশ বিঘের। ফাঁকাই পড়ে থাকে, কালেভদ্রে বাড়ির লোকেরা পিকনিক করতে যায়। তাই শুনে চিত্রার চার বন্ধু অর্থাৎ ইতিহাস অনার্সের শীলা, করুণা, দীপালি আর সুপ্রিয়া ওকে বলে, আমরাও একদিন গিয়ে পিকনিক করে আসব। কিছুদিন পরে চিত্রা ওদের জানাল, অরুণ রাজি হয়েছে। সামনের রোববার সে বাড়ির ষ্টেশনওয়াগানটাও পাচ্ছে, সবাইকে এক জায়গা থেকে তুলে নিয়ে যাবে। কলকাতা থেকে আঠারো মাইল দূরে ওদের গ্রামে যেতে বড়জোর আধঘণ্টা লাগবে। অরুণ খুব জোরে চালায়।

কলেজ ছুটির পর কাছের এক চায়ের দোকানে বসে ওরা কথা বলছিল। শীলা তার সরু গলাটা ঝুঁকিয়ে লিকলিকে হাত দুটো টেবলে রেখে বলল, "পারহেড কত করে দিতে হবে, সেটা এখনই ঠিক করে নেওয়া ভাল।"

"কাউকে কিচ্ছু দিতে হবে না, সব খরচ অরুণের।" চিত্রা তাচ্ছিল্যভরে বলার খুব চেষ্টা করেও গর্ব লুকোতে পারলনা।

"না, তা কেন।" দিপালী আপত্তি করল, "একজনের ঘাড়ে সব খরচ চাপানো উচিত হবে না।"

"আমাদের পাঁচজনের জন্য ক'টাকাই বা খরচ হবে। ওদের ব্যবসার পাবলিসিটিতেই তো বছরে যায় চল্লিশ হাজার টাকা।" বলতে বলতে চিত্রা নিজেও অবাক হয়ে গেল।

"তাহলেও আমাদের বাধো-বাধো ঠেকবেই। অরুণের সঙ্গে তোর ভাব, তোর খরচ নয় সে দিল। কিন্তু আমাদের কেন দেবে?"

"তোরা আমার বন্ধু।"

"হলেই বা। পিকনিকে সবাই সমান না হলে আনন্দ জমে না। একজনই সব দিলে বাকিদের মনে হবে অনুগ্রহ নিচ্ছি, তাই না?" দীপালি অন্যদের সমর্থন চাইল। শীলা ইতস্তত করল। সুপ্রিয়া ঘাড় নাড়ল। করুণা বলল, "কিন্তু ভাল মনে যদি খরচের সব দায়িত্ব নেয়, তাহলে অবশ্য অনুগ্রহ নিচ্ছি বলে মনে হবে না।"

"হ্যাঁ হবে।" দীপালি হঠাৎ গোঁয়ার হয়ে উঠল। "অরুণের সঙ্গে যেদিন চিত্রা আলাপ করিয়ে দিল, মনে আছে তোর সেই চীনে রেষ্টুরেণ্ট থেকে বেরিয়েই তুই কি বলেছিলি?"

শীলা সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, "কি বলেছিলুম?"

"এত খরচ করছে আর আমরা একপয়সাও খরচ করতে পারছি না, কেমন লজ্জা-লজ্জা করে। বলেছিলি কিনা বল?"

"বড্ড বড়লোক বাপু।" শীলা আত্মসম্মান বজায় রেখে হাসবার চেষ্টা করল, "ফসফস করে যেরকম পাঁচ-দশটাকার নোট বার করছিল। পিকনিকে অবশ্য বড়জোর পাঁচটাকা পর্যন্ত দিতে পারব, কিন্তু তাতে তো পেট্রল খরচও উঠবে না।"

"ট্রেনে যাব।" সুপ্রিয়া বলল।

"এতই যখন তোমাদের মান-সম্মানবোধ, তাহলে বরং না যাওয়াই ভাল।" চিত্রা উঠে দাঁড়াচ্ছিল করুণা আর সুপ্রিয়া টেনে বসাল।

"না, না আমার কাজ আছে।"

"রাগ দেখাতে হবে না আর।" করুণা চিমটি কাটল চিত্রার হাতে। "বাড়িতে তাহলে বলে দোব সব।"

"দে-না। সবাই জেনে গেছে।"

"এসব কথা এখন থাক।" দীপালী বিরক্ত হয়ে বলল, "আগে ঠিক কর যাওয়া হবে কি হবে না। মোট কথা একদম কিছু কন্ট্রিবিউট না করে যাওয়ার ইচ্ছে আমার নেই।"

"আমি জানতুম, দীপালি একটা না একটা ফ্যাকড়া বার করবেই। অরুণের বাড়িতে যাচ্ছি, সে তো আতিথেয়তা করবেই। সুপ্রিয়া তোর বাড়িতে যদি যাই, বল্, তুই কি অ্যালাও করবি আমাদের পয়সা খরচ করতে দিতে ?"

সুপ্রিয়া ঘাড় নাড়ল মাদ্রাজী ঢঙে।

এই সময় একটি ছেলে ঢুকল চায়ের দোকানে। ওদের দেখে লাজুক হেসে দূরের একটা টেবলে বসল। আদ্দির পাঞ্জাবি পরার জন্য জিরজিরে বুকের পকেটে একটাকার নোট এবং কণ্ঠার হাড় স্পষ্ট। শ্যাম্পু করা চুল ফাঁপিয়ে এলোমেলো। রুমালে সুগন্ধি ঢালে। মেয়েদের ফাই-ফরমাস পাওয়ার জন্য সতত ব্যস্ত। মুখটি কচি দেখায় দাড়ি না ওঠায়। কলেজের মেয়েরা হাসাহাসি করে ওকে নিয়ে।

"শিবুটা এখানেও। জ্বালালে।" শীলা গম্ভীর হয়ে চেয়ারে হেলান দিল বুকটা চিতিয়ে।

"আঃ, আবার!" করুণা কৃত্রিম ধমক দিল শীলাকে।

"দেখুক না, ওটা আবার পুরুষমানুষ নাকি।"

"ওসব কথা থাক।" দীপালি বিরক্ত হয়ে বলল, "কি আমরা দিতে পারি সেটা আগে ফয়সালা হোক।"

শীলা বলল, "টাকাপয়সার কথা বাদ দে। পিকনিক মানেই তো শুধু খাওয়া নয়। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত সময়টাও কাটাতে হবে। সেই রকম কিছু তো আমরা নিয়ে যেতে পারি।"

"আমাদের একটা ট্র্যানজিস্টার আছে।" করুণা উৎসাহভরে বলল।

"অরুণদের তিন-চারটে আছে।"

"দীপালি তুই কি বলিস?"

এরপর পাঁচজন চুপ করে ভাবতে শুরু করল। চা খেতে খেতে শিবু ওদের দিকে তাকাচ্ছে। টেবিলে টোকা দিয়ে একটু গুনগুন করল। খাতাটা খুলে মনোযোগে খানিকটা পড়ল। রাস্তা দিয়ে দুটি মেয়েকে যেতে দেখে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। তারপর ফুরুৎ ফুরুৎ শব্দ করে চা খেতে লাগল।

"পেয়েছি!" শীলা চাপাস্বরে বলল, "শিবুটাকে নিয়ে চল, চমৎকার সময় কাটবে"

চারজনেই প্রথমে খুব অবাক হয়ে গেল শীলার কথায়। কিছুক্ষণ চাপা স্বরে তর্ক করল।

"পাঁচটা মেয়ে আর একটা ছেলে পিকনিক করবে, কেমন যেন দেখায়। আর একটা ছেলেও চলুক না।"

"পিকনিকে খাটাখাটুনিও তো আছে, করবে কে? ওকে বরং লাগিয়ে দেওয়া যাবে।"

"না না অরুণদের মালি আছে, ওসব কাজ কাউকেই করতে হবে না। বরং ওকে জব্দ করব সারাদিন ধরে।

"কথা এখন থাক বরং ওকে গিয়ে বল।"

হঠাৎ পাঁচজনকে টেবলের সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে শিবু হকচকিয়ে গেল। ওদের অনুরোধ শুনে তার সারা শরীরটাই দুলে উঠল।

"না না, তোমরা যাচ্ছ, তার মধ্যে আমি কেন!"

"তাতে কি হয়েছে।" চিত্রা বোঝাবার জন্য বলল "তুমিও তো আমাদের বন্ধু, আমরা তোমায় ইনভাইট করছি। আমাদের সঙ্গে যাওয়া কি তুমি পছন্দ করনা?"

"না না, তাই বলেছি নাকি। তবে যার বাড়িতে যাব তারও তো মতামত নেওয়া দরকার।"

চিত্রা বলল, "তুমি আমাদের গেষ্ট, তার নয়। আমরা যাকে খুশি নিয়ে যেতে পারি।"

"শিবনাথ, তাহলে না কোরোনা। অরুণ তো আমাদের কাছেও প্রায় অপরিচিত। অবশ্য চিত্রার অসুবিধে হবে না, কিন্তু আমাদের চেনা একজন পুরুষমানুষ থাকলে স্বস্তি পাওয়া যাবে। ধরো ফট করে কারুর যদি কিছু হয়ে যায়?" শীলা গম্ভীর হয়ে বোঝাতে চেষ্টা করল।

"নিশ্চয় নিশ্চয়," শিবু জোরে ঘাড় নাড়ল। "আজকাল কখন কি হয় কে বলতে পারে। ধরো পাড়াগাঁয়ের রাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে গেল।"

"তা কেন হবে! অরুণদের গাড়িটা নতুনই, গতবছর কেনা হয়েছে।"

"চিত্রা তুই থাম্। শিবু ঠিকই বলেছে, ধর্ তেল ফুরিয়ে যায় যদি!"

অতঃপর শিবুর যাওয়া ঠিক হয়ে গেল। পাঁচটি মেয়ে চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে কিছু দূর হেঁটে গিয়ে হাসতে শুরু করল। তারপর যে যার বাড়ির দিকে রওনা হল।

*   *   *

দীপালির বাঁ কানের উপর দগদগে পোড়া চিহ্ন। বারো বছর বয়সে অ্যাসিডের শিশি তাক থেকে পড়ে যায় ওর মাথায়। কানটা দোমড়ান, চুলও ওঠেনি। একসঙ্গে কিছু যুবক সামনে দিয়ে আসছে দেখে সে মুখ ঘুরিয়ে ক্ষত লুকোবার চেষ্টা করল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে ওরা দ্বিতীয়বার আর তাকাল না। তবে ঘাড়

ঘুরিয়ে ওদের মধ্যে একজন তাকে পিছন থেকে দেখল। দীপালি জানে, যে দেখল তার মুখ দিয়ে আক্ষেপসূচক ধ্বনি নির্গত হবে, দুই চোখে বিস্ময় ফুটবে। তার সুঠাম দেহ বহুক্ষণ ফিরে ফিরে দেখবে! ওই পর্যন্তই, দীপালি তা জানে। গভীর রাতে মাঝে মাঝে সে কাঁদে।

বাস স্টপে দাঁড়িয়ে শীলার ভাবনা হল, পিকনিকে যাওয়া তার হয়ে উঠবে কিনা। আবার ভাই কিংবা বোন হবে। কদিন ধরে মা আর নড়াচড়া করতে পারছে না। অতবড় সংসার চালানোর ভার এখন তার ঘাড়ে। অবশ্য তেরোবছর বয়স থেকেই সে মার আঁতুড় তুলছে। কিন্তু একদিনের জন্যও কি এখন বাড়ির বাইরে থাকা চলে? ভাবনায় পড়ল শীলা। তারপর মা বাবা ভাই বোনদের উপর প্রচণ্ড রাগে দপদপ করে উঠে, বাসের অপেক্ষায় না থেকে হাঁটতে শুরু করল।

দ্রুত চলেছে সুপ্রিয়া, টিউশানীতে তার দেরী হয়ে গেছে। কুড়িটাকার জন্য রোজ দুটো বিচ্ছুকে নিয়ে একঘণ্টা বসতে হয়। তার থেকেও সমস্যা ওদের মা-ঠাকুমাকে নিয়ে। রোজ শুনতে হচ্ছে তার মিষ্টিমুখ দেখে নাকি সংসারী হবার সাধ জেগেছে বাড়ির টাকমাথা হোঁৎকা চেহারার প্রৌঢ় ছোটছেলের। প্রায় ছশো টাকা মাইনে পায়। সুপ্রিয়া টের পাচ্ছে হয়তো একেই বিয়ে করতে হবে। কেননা ওরা শিগগিরই তার বাবার কাছে প্রস্তাব নিয়ে আসবে এবং তা ফেরাবার সাধ্য চার মেয়ের স্কুল-শিক্ষক বাবার নেই। চলতে চলতে সুপ্রিয়ার মনে হল, সামনের মোড়টা ঘুরলেই কেউ যদি তার মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে দেয়। মোড় ঘুরে দেখল একটি সুদর্শন তরুণ তাকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। সুপ্রিয়ার মন খারাপ হয়ে গেল।

করুণা একা দাঁড়িয়ে চৌমাথার মোড়ে। কাছেই বাড়ি। কিন্তু বাড়ি গিয়ে কি করবে? বৌদি বলবে সিনেমা চলো, বাবা

বলবে সেতার বাজিয়ে শোনা, মা বলবে একফোঁটাও দুধ ফেলে রাখা চলবে না, মাষ্টারমশাই বলবে ফার্স্ট-ক্লাশ পাবার মত মাথা আছে, বাবা বলবে ওকে ফরেন পাঠাব, বৌদি বলবে রোজ স্কিপিং করো, মা বলবে সন্ধেবেলায় শুয়ে থাকতে নেই, মাষ্টার মশাই বলবে যে-সব প্রশ্নের উত্তর লিখিয়ে দিয়েছি মুখস্ত করোনি কেন, বৌদি বলবে এখনো কেউ তোমাকে প্রেমপত্র দেয়নি তা কি হয়, বাবা বলবে পছন্দ করে যদি বিয়ে করিস আপত্তি করব না, মাষ্টার মশাই বলবে আজকাল আর তুমি মন দিয়ে মোটেই পড়া শোনোনা।

করুণা একা দাঁড়িয়ে ভাবল, বাড়ি গিয়ে কি করব ?

* * *

গাড়ি চালাতে চালাতে অরুণ বলল, "নিন্ সিগারেট খান।"

শিবু ঘাড় নাড়ল।

"সে কি ! আপনি তো অ্যাডাল্ট, প্রাপ্তবয়স্ক।" বলে অরুণ ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েদের দিকে চেয়ে হাসল।

"শিবু লজ্জার কি আছে, আমরা কি তোমার মা-মাসি ?" করুণা আঙুল দিয়ে শিবুর কাঁধে খোঁচা দিল।

"ইণ্ডিয়ান সিগারেট নয়। খেয়েই দেখো একটা।" চিত্রা গম্ভীর স্বরে বলল।

এরপর সকলের অনুরোধে শিবু খেতে শুরু করল। অভ্যাস নেই। একটু পরেই কাশতে লাগল।

"ও কি, ছেলেমানুষের মত কাশছ কেন ? আমি হলে তিন টানে শেষ করে দিতুম।" শীলা ধমক দেবার ভঙ্গিতে বলল, এবং হাত বাড়াল, "দাও দেখিয়ে দিচ্ছি।"

"না না।" শিবু সিগারেটটা সরাতে গিয়ে অরুণের স্টিয়ারিং ধরা হাতে ছ্যাঁকা দিল। অরুণ চমকে উঠতেই গাড়িটা বেটাল হয়ে ধাক্কা দিল পথের পাশে দাঁড়ানো একটা সাইকেলরিক্সার চাকায়। চাকাটা তুমড়ে গেল।

হৈ-হৈ করে কোত্থেকে ছুটে এল একদল লোক। গাড়ি ঘিরে তারা উত্তেজিত কথাবার্তা বলতে থাকল। চিত্রা ভয়ে আঁকড়ে ধরল অরুণের হাতটা। অন্য মেয়েরা শুকনো মুখে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে। শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়া শিবুর দেহযন্ত্রের বাকি অংশ মৃতবৎ।

"হয়েছে কি।" অরুণ দরজা খুলে বেরোল। তু-পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে বুক চিতিয়ে সুন্দর স্বাস্থ্যটা জনতাকে দেখাল। "কেউ তো মরেনি, তবে এত কথা কিসের?" তার কর্তৃত্ববাচক কণ্ঠের দাপটে ওরা থ মেরে গেল। "সারাতে কত লাগবে?" পকেট থেকে জাঁদরেল একটা ওয়ালেট এবং তারমধ্য থেকে অনেকগুলো নোট বেরিয়ে আসতে দেখে নিভন্ত অগ্নিস্তূপ থেকে ফুলকির মত কিছু ফিসফাস ছিটকে উঠল।

"পঞ্চাশ টাকা লাগবে।" ওদের মধ্য থেকে একজন বলল।

"সারিয়ে নিতে পঞ্চাশ টাকা?" ভ্রু কুঁচকে অরুণ ধমকাল। কতগুলো নোট একজনের হাতে গুঁজে দিয়ে গাড়িতে উঠল। স্টার্ট দিতেই জনতা পথ ছেড়ে দিল।

মাইলখানেক যাবার পর চিত্রা প্রথম কথা বলল, "ওরা গাড়ীটা পুড়িয়ে দিত, না?"

"কি জানি।" অরুণ শিষ দেবার জন্য ঠোঁট সরু করে কি ভেবে, ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েদের দিকে তাকাল! "সব চুপচাপ কেন। আরে ও কিছু নয়, নিন্ গান ধরুন।" বলেই চেঁচিয়ে শুরু করল, "আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত···।" শুধু চিত্রা ওর সঙ্গে যোগ দিল।

পিছনের সীটের চারজন মেয়ে কাঠের মত বসে। হঠাৎ শিবু প্রাণপণে অরুণের সঙ্গে গলা মেলাতে লাগল। মিহি স্বরকে উদাত্ত করতে গিয়ে স্বর ভেঙে যাচ্ছে, সেটা বুঝতে পেরে খানিক বাদে থেমে গেল।

"থামলেন কেন, চলুক···আমরা ভাঙ্গিগড়ি—."

শিবু বাকি পথটা চীৎকার করতে করতে একা গান গেয়ে গেল। গাড়ি থেকে নেমেই দীপালী চাপা স্বরে শীলা, সুপ্রিয়া, করুণাকে বলল, "ওটাকে না আনলেই হত।"

কিছুক্ষণ পরেই ওরা রান্নার উদ্যোগে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মালি বারো মাইল দূরে তার গ্রামে গেছে। সকালে খবর এসেছে বাঘে তার বাবাকে মেরে, আধ-খাওয়া দেহটা ফেলে রেখেছে। শুনেই সুপ্রিয়া বলল, "বাঘটা যদি এখানে আসে?"

"কেন শিবু রয়েছে, ভয় কি আমাদের।" তিক্তস্বরে দীপালি বলল।

"বাঘ কিন্তু মানুষ নয়," অরুণ হাসতে থাকল। "টাকা দিয়ে পার পাওয়া যাবে না।"

চিত্রা ছাড়া কেউ উচ্চস্বরে হাসল না। কলকাতা থেকে খাওয়ার সামগ্রী অরুণ এনেছে। শিবু উনুন ধরানোয় ব্যস্ত। কাজের ছুতোয় সে সকলের আড়ালে থাকতে চাইছে। অন্যরা কিছুক্ষণ বাগানে বেড়ালো। বেল এবং কলা ছাড়া আর কিছু ফলেনি। কয়েকটা নারকেল গাছ রয়েছে। অরুণ জুতোজামা খুলে একটা গাছে ওঠার চেষ্টা করল। হাত দশেক উঠে হাল ছেড়ে নেমে এসে বলল, "বড্ড পিছল। তবে দিন দুয়েক তালিম নিলেই হয়ে যাবে।"

করুণা ফিসফিস করে শীলার কানে বলল, "সব কিছুতেই বাহাদুরির চেষ্টা, না?"

শীলা ঘাড় নাড়ল। চিত্রা লক্ষ করেছে এই কানাকানি।

কাছে এসে কারণ জানতে চাইল। শীলা বলল, "করুণা বলছিল তোদের দুজনকে বেশ মানায়।"

চিত্রা উথলে উঠে কি করবে ভেবে না পেয়ে বলল, "শিবুটার এমন মেয়েলি স্বভাব, রান্না ছেড়ে কিছুতেই আসবেনা। চল ওকে ধরে আনি।"

করুণা আর শীলাকে টানতে টানতে চিত্রা নিয়ে চলল রান্নার দিকে। তখন সে বলল, "তোদের ভাল লাগছে অরুণকে? খুব চঞ্চল ছটফটে, নারে?"

"সেইটাই তো ভাল, তবে কি শিবুর মত হবে?" শীলা বলল, এবং করুণা ঘাড় নাড়ল।

"ওর সঙ্গে কোন তুলনাই চলে না। খুব ভাল হত যদি অরুণের মত তোদেরও কেউ থাকত।" চিত্রা সমবেদনা জানাল যেন। তাতে দুজনেই হাসবার চেষ্টা করল। তিনজনকে দেখে শিবু বলল, "দেখতো নুন হয়েছে কিনা।" বাটিতে খানিকটা ঝোল এগিয়ে ধরল। চোখে-মুখে উত্তেজনা। চিত্রা চুমুক দিয়ে জানাল নুন কম হয়েছে।

"শিবু, আমরা একসঙ্গে রয়েছি, আর তুমি এভাবে আলাদা হয়ে থাকলে খুব খারাপ লাগবে। চলো।"

"বাঃ, খাওয়া-দাওয়া করতে হবে না বুঝি!"

"হবে। ওসব পরে করলেও চলবে, এখন তুমি বেরিয়ে এস।"

শিবু কিছু আপত্তি করে অবশেষে, "নুন দিয়ে মাংসটা নামিয়েই যাচ্ছি" বলে ওদের বিদায় করল।

পুকুরের বাঁধানো ঘাটে বসে কিছুক্ষণ গল্প করে ওদের আর ভাল লাগল না। তখন অরুণ বলল, সাঁতার কাটা যাক। কেউ সাঁতার জানে না। কস্টিউম পরে অরুণ যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল, ওর জানুদ্বয় ও নাভি এই নির্জন স্থানে মেয়েদের কাছে অস্বস্তিকর হয়ে উঠল। তারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিজেদের মধ্যে আবোল-তাবোল কথা শুরু করল আর অন্যমনস্ক হবার ভান

করতে লাগল। অরুণ একাই, জলে কিছুক্ষণ ঝাঁপাঝাপি করে, জলে নামার জন্য ওদের ডাকতে থাকল। অবশেষে চিত্রা নামল এবং তাকে পিঠে নিয়ে অরুণ সাঁতরাতে শুরু করল।

"বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে।"

"রীতিমত অসভ্যতা। এসব কি! আমরা রয়েছি খেয়াল নেই?"

চারজন মেয়ে এইভাবে কথা বলতে থাকল এবং শিবু চুপকরে দেখছিল সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে। দীপালী বলল, "সাঁতার জাননা, তুমি যে কি একটা।"

লজ্জায় তোতলা স্বরে শিবু বলল, "একটু একটু পারি।"

"নামো তাহলে।" চারজন এক সঙ্গে টানতে টানতে শিবুকে জলে ঠেলে দিল। অরুণ খুবই উৎসাহিত হল। চিত্রাকে ঘাটে পৌঁছে দিয়ে বলল, "চলুন পারাপার করি।"

"না না পারব না আমি।" প্রায় পঞ্চাশ মিটার লম্বা পুকুরের ওপারে তাকিয়ে শিবু বলল। "সেই ছোটবেলায় সাঁতার শিখে-ছিলাম, বছর দশেক হয়ে গেল। তারপর আর কাটিনি।"

কিন্তু সকলের বারংবার অনুরোধে রাজি হয়ে গেল। অরুণ যখন ওপারে ছুঁয়ে এপারের ঘাটে এসে পৌঁছল, শিবু তখনো ওপারেই পৌঁছয়নি। শুরুতে মেয়েরা হৈ-হৈ করে শিবুকে উৎসাহ দিচ্ছিল। পরে চিত্রা ছাড়া বাকি চারজন চুপ করে গেল এবং ক্রমশ তাদের মুখে কাঠিন্যের জটিলতা এল। সুপ্রিয়া বলল, "ইচ্ছে করছে চুলের মুঠি ধরে ওটাকে চুবুনি দিই।"

"আমারও।" দীপালি বলল। তারপরই এক সঙ্গে ওরা চেঁচিয়ে উঠল, "একি! ডুবে যাচ্ছে নাকি?" মাঝ-পুকুরে শিবু ঘাটের দিকে অসহায় চোখে তাকিয়ে প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়ছে, হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। ঝাঁপিয়ে পড়ল অরুণ। শিবু ওকে জড়িয়ে ধরতে যেতেই মুখে ঘুঁষি মেরে চুল ধরে টানতে টানতে নিয়ে

এল ঘাটে। অবসন্ন হয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে মাথা নামিয়ে শিবু বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। চিত্রা বলল, "ও কি ডুবে যাচ্ছিল?"

"বোধহয়।" অরুণ কাঁধ ঝাঁকাল।

মাংস ভাত ছাড়া আর কিছু রান্না হয়নি। ঝোলমাখা ভাত মুখে দিয়েই সবাই শিবুর দিকে তাকাল। থু থু করে ফেলে দিয়ে দীপালি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অরুণ উঠে গিয়ে তাকে ধরে আনল, "নুন বেশি হয়ে গেছে হোক না। দই মেখে সন্দেশ দিয়ে ভাত খান।"

"একটা কিছুও যদি পারে।" শীলা চেঁচিয়েই বলল। "খালি বাহার দিয়ে মেয়েদের পিছনে ঘুরঘুর করা।"

শীলাকে চুপ করিয়ে দেবার জন্য অরুণ তাড়াতাড়ি বলে ওঠল, "এমন আর কি নুন হয়েছে, আমার তো বেশ লাগছে। শিবনাথবাবু ওদের কথা একদম বিশ্বাস করবেন না। ওরা না খায় তো না খাক, আমরা বরং ভাগাভাগি করে সাবড়ে দি।" অরুণ ভাতের গ্রাস মুখে দিল।

"আমি একাই খেয়ে ফেলতে পাবি সবটা।" শিবু টেনে টেনে হাসতে শুরু করল।

"থাক্, আর বাহাদুরি করতে হবে না।" শীলা তাচ্ছিল্যভরে বলতেই শিবু মাংসের হাঁড়িটা নিয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। কেউ ওকে ফিরিয়ে আনল না।

খাওয়ার পর দোতলার বারান্দায় পা ছড়িয়ে সবাই গল্প করছে! অরুণ আর চিত্রা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছে, ভ্রুকুটি করছে, জিভ দেখিয়ে ভেংচি কাটছে, কিল দেখাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে গল্পে যোগ দিচ্ছে। হঠাৎ চিত্রা উঠে তিনতলার ছাদে চলে গেল। কিছুক্ষণ উশখুশ করে অরুণও উঠল—"কি করছে দেখে আসি" অজুহাত দিয়ে।

চারটি মেয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে থাকল। কিছু পরেই শিবু এল জ্বলজ্বলে চোখে।

"ভেবেছিলে পারব না? সব শেষ করে দিয়েছি।"

"দু-কিলো মাংস খেয়ে ফেললে?"

"বাজে কথা। নিশ্চয় কোথাও ফেলে দিয়েছ কি কুকুরগুলোকে খাইয়ে দিয়ে বাহাদুরি ফলাচ্ছ।"

"মোটেই না। তোমরা চারদিক পরীক্ষা করে দেখতে পার।"

বসে থাকতে ভাল লাগছে না। একটা উপলক্ষ পেয়ে বাগানে বেরিয়ে চারজন চারিদিকে খুঁজতে শুরু করল। একসময় করুণা ছুটতে ছুটতে দীপালির কাছে এসে বলল, "একটা ব্যাপার দেখবি আয়।"

বাগানের একধারে একটা মাটির ঘর। সম্ভবত চেলাকাঠ, ঝুড়ি-কোদাল ইত্যাদি রাখার। দরজা বন্ধ। দীপালিকে টেনে এনে করুণা বলল, "কান পেতে শোন।"

সন্তর্পণে দীপালি দরজায় কান ঠেকিয়ে ফিরে এল পাংশু মুখে। "অরুণ আর চিত্রা।"

"হ্যাঁ, ছাদে যাবার ভান করে এখানে!"

"আগে থাকতেই প্ল্যান করেছিল।"

অন্য দুজনকে ডেকে ওরা খবরটা দিল। অবশেষে চারজনেই যখন ফিরে এল শিবু প্রবল উত্তেজনা নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "পেলে?"

"কি পাব?"

"যা খুঁজতে গিয়েছিলে?"

ওরা কেউ জবাব দিল না। নিজেদের মধ্যে এলোমেলো কথা শুরু করল।

"আজকের খবরের কাগজটা পড়ে আসা হয়নি।"

"বাবা বারণ করেছিল আসতে, জোর করে এসেছি।"

"আমার ঠিক উলটো, মা কোন ভোরে ঘুম থেকে তুলে দিয়েছে।"

থেকে অরুণ আর চিত্রা বেরোল। তারপর ছুটে এল শিবুর মৃতদেহের কাছে। তখুনি গাড়িতে তুলে ওরা রওনা হল কলকাতার দিকে।

সুপ্রিয়া শুধু একবার বলেছিল "যদি বাঘটা এখন বেরোয়!" তাছাড়া পথে কেউ কথা বলেনি। সারাপথ ওদের পায়ের কাছে শাড়ি ঢাকা শিবু শোয়ান ছিল।

শহরে আসা

দুলালের তিনকুলে কেউ না থাকায় এতদিন বিয়ে হয়নি। দর্জির দোকানে সেলাইয়ের কাজ করে পায় মাসে আশিটি টাকা। বায়ান্ন-তিপ্পান্ন বয়সে পাড়ার লোকেরাই উদ্যোগ করে কাছাকাছি এক গ্রামের একটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিল। গিরিবালার বয়স সতেরো। তারও তিনকুলে কেউ নেই। ওকে যত্নে রাখতে দুলাল আপ্রাণ করে।

কথায় কথায় দুলাল একবার বলেছিল, তোমাকে কলকাতা দেখাব। একদিন সে পাঁচটা টাকা উপরি পেয়ে যেতে একবেলার ছুটি নিয়ে বেরলো গিরিকে কলকাতা দেখাতে। পরনে ধোপা-বাড়ির কাচানো ধুতি-শার্ট, দাড়ি কামিয়ে জুতোয় কালি দিয়েছে। চুলে পাতা কেটে টাকের কিছুটা ঢেকেছে, দুপুরে সন্না দিয়ে গোটা কয়েক পাকা গোঁপও তুলেছে। মোক্তার গিন্নি পুরনো সিল্কের শাড়ি দিয়েছিল বিয়েতে, গিরি সেইটা আর দুলালের কিনে দেওয়া জরি লাগানো সবুজ চটি আর প্লাস্টিকের চুড়ি পরেছে। টেনে চুল বেঁধে মস্ত খোঁপা করে লাল রিবন দিয়েছে, পায়ে আলতা। গিরিবালা বেরোবার আগে অনেকক্ষণ মুখে সাবান ঘষেছে।

জুতো পরে হাঁটতে দুলালের কষ্ট হচ্ছে। পাড়ার ছেলেদের মুচকি হাসিতে সে লজ্জা পেল। তার ভয় করল গিরিবালা কলকাতায় না হারিয়ে যায়। হেলথ সেণ্টারের নার্স মেয়েটি কোয়ার্টারের জানালায় দাঁড়িয়েছিল, গিরিকে ডেকে ভুরুতে লাগা

পাউডার মুছিয়ে, টিপ পরিয়ে, গাল টিপে দিয়ে বলল, "বউ খুব সুন্দর।" নার্স কলকাতার মেয়ে। এর পর বুক চিতিয়ে জুতোর খটখট শব্দ করে দুলাল গিরিবালার আগে আগে হাঁটতে লাগল।

ট্রেনে ভিড় নেই। কিন্তু জানালার ধারের জায়গাগুলো ভর্তি। গিরি জানালার ধারে বসতে পেলে খুশী হবে এই ভেবে দুলাল একজনকে বলল, "এনার শরীরটা খারাপ, যদি এ ধারটায় বসেন বড় উবগার হয়।"

লোকটি কাগজ পড়ছিল। গিরিকে এক পলক দেখে জায়গা ছেড়ে দিল। গিরির চোখের ভাষা পড়ে দুলালের মনে হল যেন বলছে, বাব্বাঃ কি চালাক তুমি! দুলাল ঠিক করল আজ সে বিড়ি খাবে না।

হাওড়া স্টেশনে নেমেই শক্ত মুঠোয় সে গিরির হাত চেপে ধরল। বড় খারাপ জায়গা। গিরিকে প্রায় টানতে টানতে স্টেশনের বাইরে এল। হাওড়া ব্রীজ দেখেই গিরির চোখ আর সরে না। অস্ফুটে মুখে শব্দ করল, ইস্‌স। বিদেশীকে নিজের সাম্রাজ্য দেখাবার ভঙ্গিতে দুলাল আঙুল দিয়ে গঙ্গার ওপারে উঁচু একটা বাড়ি দেখিয়ে বলল, "ওটা বিশতলা। আমি একবার উপরতলায় উঠেছিলুম।"

দুলাল মিথ্যা বলল। সে ও বাড়িটার ধারে কাছেও যায়নি। কিন্তু উঁচু উঁচু জিনিস দেখে গিরির চোখে মুখে যে ভাব ফুটছে, তাতে তার নিজেরও বড় হতে খুব সাধ হচ্ছে। কোন দিকে যে তাকাবে গিরি তা স্থির করতে না পেরে এধার ওধার দেখছিল। এখন সে দুলালের মুখের দিকেই তাকাল। তাতে দুলালের নিজেকে কয়েক গুণ উঁচু বলে বোধ হল। ভারিক্কী চালে সে বলল, "এই সব বাসগুলো দোতলা। আমরা উপরতলাতেই বসব। ফেরার সময় তখন আঁধার নেমে যাবে, পোলে আলো জ্বলবে, আমরা হেঁটে আসব পোলটার উপর দিয়ে। দেখবে কেমন অদ্ভুত লাগবে।"

ঘাটে নেমে গিরি গঙ্গাজল মাথায় স্পর্শ করে জোড় হাতে

প্রণাম করল। দেখাদেখি দুলালও করল। গিরি বলল, "একটা ঘটি আনলে হোত।"

একথা শুনে দুলালের খুব মজা লাগল। বলল, "তুমি কি ঘটি হাতে কলকাতা ঘুরে বেড়াতে? আমি একদিন এসে এক ঘড়া গঙ্গাজল নিয়ে যাবখন।"

ওরা বাসের দোতলায় উঠে বসল। ব্রীজের উপর দিয়ে যাবার সময় বাতাসে গিরির ঘোমটা খসে যাচ্ছিল, হাত দিয়ে চেপে ধরে সে বাইরে তাকিয়ে হাসতে লাগল। দুলাল তাকে এটা-সেটার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে শুরু করল। বাস অফিসপাড়া ডালহৌসিতে পৌঁছনমাত্রই ভীষণ ভিড় হয়ে গেল। ধর্মতলায় নামবার সময় দুলাল ফাঁপরে পড়ল। গিরিকে পিছনে রেখে নামতে তার ভরসা হলনা, পাজি কেউ এই সুযোগে গায়ে হাত দেয় যদি! এগোবার জন্য দুলাল ঠেলা দিল। গিরি কোথাও কোন পথ না দেখে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে। পিছনের লোকেরা তাড়া দিচ্ছে। বিরক্ত হয়ে নানাকথা বলতে শুরু করেছে। কয়েকজন বেঁকেচুরে বেরোবার একটু জায়গা করে দিল। লজ্জায় প্রায় চোখ বন্ধ করে গিরি ঠেলে-ঠুলে সিঁড়ি দিয়ে নামল। নীচে আরও ঠাসাঠাসি। গিরি কোন দৃকপাত না করে সামনের লোকদের ধাক্কা দিয়ে, একেবারে রাস্তায় নেমে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে বাসটা ছেড়ে দিল।

খিলের মত দুটো হাত দুলালের সামনে হঠাৎ পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। বাস ছেড়ে দিতেই সে "গিরি, গিরি" বলে চেঁচিয়ে উঠে, সামনের লোককে ঠেলে নামতে যাচ্ছে তখন একজন ওর কলার ধরে আটকে বলল, "অ্যাকসিডেণ্ট হবে যে মশায়।" বাস জোরে চলতে শুরু করেছে। দুলাল শুধু, "ও যে একা রয়ে গেল।" বলে ঠকঠক করে কেঁপে উঠল।

বাসটা পরের স্টপে থামতেই দুলালকে ওরা ঠেলে নামিয়ে দিল। সে ছুটতে শুরু করল। কিছুটা গিয়ে থমকে দাঁড়াল। গিজগিজে

ভিড়। কোথায় যে গিরি নেমেছে বুঝতে পারছে না। হাঁটতে হাঁটতে দূর থেকে দেখল গিরি এই দিকেই মুখ করে মুখে আঁচল চেপে দাঁড়িয়ে। দুলাল কাছে এসে দাঁড়াতেই সে প্রাণপণে ফোঁপানি চেপে শুধু তাকিয়ে রইল। দুলাল হাসবার চেষ্টা করে বলল, "ভয় কি! এখানে হারিয়ে যাওয়া সোজা ব্যাপার নাকি?"

হাঁটতে গিয়ে গিরি বলল, তার এক পাটি চটি বাসেই রয়ে গেছে। ফাঁপরে পড়ল দুলাল। শেষে ভাবল, আর এক পাটি কিনে নিলেই তো হবে। চটিটা যত্নে পকেটে রাখার সময় মনে হল গিরির পা কি ছোট্ট!

ওরা এ রাস্তা সে রাস্তা দিয়ে অনেক ঘুরল। গিরি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কোথাও একটু জিরোন দরকার। দুলালের মনে পড়ল, আর একটু এগিয়ে বাঁদিকের ট্রাম রাস্তায় রাইমোহনদার চায়ের দোকান, সেখানে বসে জিরোন যায়। কিন্তু বছর পাঁচেক আগে রাইদার কাছ থেকে দুটো টাকা ধার নিয়ে সে আর এমুখো হয়নি। সেকথা যদি ওর মনে থাকে তা হলে বড় লজ্জায় পড়তে হবে। 'কেটে করকরে পাঁচটাকার একটা নোট আর কিছু খুচরো রয়েছে, এখুনি শোধ করে দিতে পারে বটে, কিন্তু এই পাঁচবছর শোধ না করায় হয়তো চোর-জোচ্চোর ভেবে বসে আছে। তারপর দুলাল ভাবল, রাইদা দিলদরিয়া মানুষ, দু'টাকার কথা কি মনে করে রেখেছে। তাছাড়া গিরিকে সঙ্গে দেখলে এ কথা তুলবেই না বরং চপ-কাটলেট খাইয়ে দেবে।

"কখনো কাটলেট খেয়েছো?"

গিরিকে মাথা নাড়তে দেখে দুলাল খুশী হল। তাহলে কলকাতা আসা সার্থক হয়েছে।

"চলো, তোমাকে খাওয়াব।"

এই বলে সে গিরিকে নিয়ে কিছুটা হেঁটে একটা রেস্টুরেন্টের সামনে হাজির হল। দরজার পাশে ঘণ্টা আর মৌরীর প্লেট রাখা

টেবলটায় রাইদার জায়গায় এক ফিটফাট ছোকরা বসে। দেখে দুলাল দমে গেল। ব্যাপার কি, দোকান কি হাত-বদল হয়েছে? দুলাল জিজ্ঞাসা করবে কি না ইতস্তত করছিল, তখন দোকান থেকে তোয়ালে ঘাড়ে একটা লোক বেরিয়ে এসে বলল, "ভেতরে কেবিন খালি আছে, আস্থন না।"

দুলাল তাকে বলল, "রাইদাকে দেখছি না! কোথায়?"

"বাবু তো অনেক দিন থেকেই আর বসেনা, ওনার ছেলে বসে। তবে রোজ সন্ধ্যেবেলা একবার করে আসে।"

দুলাল বুঝল, রাইদা এখন ছেলেকে ব্যবসা শেখাচ্ছে। তবে ঘাগু লোক তো, ঠিক একবার করে এসে খোঁজ নিয়ে যায়।

ফিটফাট ছোকরাটির কাছে একগাল হেসে দুলাল দাঁড়াল। "তুমি রাইদার ছেলে? তা ভাল। এত্তটুকু তোমায় দেখেছি। আমায় চিনবেনা, আমি হলুম দুলাল মান্না, সিঙুরে থাকি। সেই যুদ্ধের আগে আমি আর রাইদা একসঙ্গে শ্যালদার মেসে কাজ কত্তুম।"

ছোকরাটি ভ্রু কুঁচকে চশমার মধ্য দিয়ে দুলাল ও গিরিবালাকে আদ্যপান্ত দেখল। বেশ বিরক্ত ভাব। এক খদ্দেরের বিল নিয়ে ভাঙানি দিয়ে শুকনো গলায় বলল, "বাবা তো আজ আসবে না।"

দুলাল বিপন্ন বোধ করল। এখন চলে যাবে কি না ভাবল। ছোকরা বিরক্তস্বরে বলল, "বাবাকে কি দরকার?"

"না, এমনি। প্রত্যেকবার এলেই তো দেখা করে যাই। আজকের আলাপ-পরিচয় নয়তো। রাইদা আমায় ছোটভায়ের মত দেখে। এবার অনেক দিন পর এলুম তো।" দুলাল আরও অনেক কথা বলত, কিন্তু ছোকরাকে খাতা পেন্সিল নিয়ে হিসাব কষতে দেখে থেমে গেল। অপ্রতিভ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে গুটি-গুটি ফিরে এল গিরির কাছে। "রাইদা এখনো আসেনি। বরং রাস্তায় দাঁড়াই এলে ভেতরে যাব।"

ওরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। বহুক্ষণ পরে দুলালের মনে হল, ফতুয়াপরা লম্বামত যে লোকটা দোকানে ঢুকল সেই রাইদা। কয়েক পা এগিয়ে সে ঘাড় উঁচিয়ে তাকাল। ছোকরাটা গজগজ করে কি সব বলছে। দুলাল এবার চিনতে পারল। রাইদা মাথা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল দোকান থেকে। লম্বা কাঠামোটা সামনে ঝুঁকে পড়েছে, হাত-পাগুলো বাঁখারির মত শরীর থেকে ছিরকুটে বেরিয়ে। কার্ত্তিক ঠাকুরের মত চেহারার এ কি দশা! গোঁপটা পর্যন্ত নেই।

দুলালের ডাক শুনে রাইদা ফিরে দাঁড়াল। দুলাল এগিয়ে গিয়ে গলা ভারকরে, বলল, "সেই কখন থেকে তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে।"

"কেমন আছিস রে দুলে।" রাইদা হেসে দুলালের হাত ধরল।

"ভাল। কিন্তু তোমায় তো চেনাই যায় না।"

"আর কি, বয়স তো তিন কুড়ি হল। শরীর একেবারে গেছে। তুই তো দিব্যি রয়েছিস।"

লাজুক হেসে দুলাল বলল, "রাইদা আমি বে করেছি।" গিরিকে ইশারায় দেখাল।

রাইদা অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, "বড্ড কচি রে, এই বয়সে আবার কেন জড়িয়ে পড়লি। বেশ তো এতগুলো বছর কাটালি।"

দুলাল অপরাধীর মত মাথা নিচু করে বলল, "গিরিবালা বড় ভাল মেয়ে. আমায় যত্ন করে খুব।" তারপর গিরিকে ডেকে বলল, "তোমার ভাসুর, পেন্নাম করো।"

পথ চলতি লোকেরা গিরির প্রণাম করা দেখতে দেখতে গেল। রাইদা মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করল। "তোদের কোথায় যে বসাই, দোকান তো আর এখন আমার নয়, ছেলের।"

"ভালই করেছ। এই বয়সে আর তোমার এসব ধকল না পোয়ানই ভাল। ছেলেকে মানুষ করেছ, এবার বিশ্রাম করো। কম পরিশ্রম তো করোনি!" দুলাল বিজ্ঞের মত মাথা দোলাল। বৌবাজারের রাস্তা ধরে যত লোক যাচ্ছে, রাইদা তাদের মাথার ওপর দিয়ে অনেক দূরে তাকিয়ে থেকে বলল, "জানিস দুলে, আঙুর মরে গেছে।"

"সেই বৈঠকখানার আঙুর?"

"কলেরায়। চেষ্টা করেছিলুম অনেক, শ' দুয়েক টাকা দেনাও হয়ে গেল। এই নিয়ে বাড়িতে অনেক অশান্তি হল। শেষে ছেলের নামে দোকান লেখাপড়া করে দিয়ে রেহাই পেলুম। তোর বৌদিকে তো আর জানিস না। এখন দুমুঠো খেতে দেয় আর শুতে দেয়। নেশাটাও ছাড়তে হয়েছে, ছেলের কাছে হাত পাততে লজ্জা করে।" রাইদা হাসবার চেষ্টা করল।

"বড় দুঃখে আছ রাইদা, তাই না।"

"ছেলের কাছে অপমান হলে বড় লাগে, তুই এসব বুঝবি না।"

"রাইদা তোমার কাছে দুটো টাকা একবার ধার নিয়েছিলুম, সেটা শোধ দিতেই এসেছি।"

রাইদার চোখে জল এসে পড়ল। ধরা গলায় বলল, "কোথায় তোদের জন্য আমি খরচ করব, তা না তোরাই আমায় দিতে এসেছিস।"

"এভাবে কুটুমের মত কথা বোলোনা।" দুলাল পকেট থেকে পাঁচ টাকার নোট বার করে ফাঁপরে পড়ল। এটা ভাঙাতে হবে। মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল।

"তুমি বরং একটু অপেক্ষা কর রাইদা, আমরা চট করে তোমার দোকান থেকে কিছু খেয়ে আসি। ওকে বলেছি কাটলেট খাওয়াব।"

গিরিকে নিয়ে দুলাল দোকানে ঢুকল। ভ্রু কুঁচকে ছেলেটা এমনভাবে তাকাল যে, দুলালের হাড়পিত্তি জ্বলে গেল।

"বসার জায়গা আছে ?"

গিরি পর্যন্ত চমকে উঠল তুলালের গলার আওয়াজে।

"কি দরকার ?"

"খাবো।"

ছেলেটা ঘণ্টা বাজালো।

কেবিনে বসেই তুলাল বলল, "কাটলেট দাও,বাসিটাসি না হয়।"

একটা আধ-ন্যাংটো মেয়ের ছবি দেয়ালে। গিরি মাথা হেঁট করে বসে। তুলাল ফিসফিস করে বলল, "রাইদার ছেলের কথা শুনলে। আমাদের যেন মানুষ বলেই গ্রাহ্যি করল না। ঠিক আছে, চার আনা বখশিশ করে যাব।"

একটা বিড়াল টেবলের নীচে ঘুরঘুর করে পায়ে ল্যাজ বুলোচ্ছে তুলাল তাকে লাথি কষাল। ওর রগের শিরাটা ফুলে উঠেছে। গোগ্রাসে কাটলেট শেষ করে সে বলল, "এবার চপ খাওয়া যাক। বুড়ো বয়সে বাপ আরামে থাকবে, ছেলে তার সেবা করবে। তা নয় বাপ এসে হাত পাতছে আর ধমক খাচ্ছে। ভাবে সবাই বুঝি ওর বাপের মত হাত পাততে আসে।"

চপ আসতে দেরী হচ্ছে। তুলাল বিকট চীৎকার করল, "কই হে দেরী হচ্ছে কেন।"

"আঃ চেঁচাচ্ছ কেন।" পর্দা সরিয়ে ছেলেটা ভ্রু কুঁচকে বলল, "ভেজে দেবে, দেরী হবে না ?"

"দেরী করার আমার সময় নেই। অন্য কি তৈরী আছে ?"

"তা হলে মটন কারি খান।"

"তাই দেখি, জলদি।"

চলে যাওয়া মাত্র তুলাল ফিসফিস করে বলল, "কি কষ্ট করে এ দোকান গড়ে তুলেছে, তা আমি জানি। আর তাকেই আজ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। বখশিশ আটআনা দোব। দেখিয়ে দোব বাজে লোকদের সঙ্গে রাইদার পরিচয় নয়।"

খাওয়া শেষ করে তুলাল বলল, "কত হয়েছে ?"

"চা খাবেন না ?"

"না হে, অত সময় নেই।"

লোকটা বিল এনে দিল! তা দেখেই তুলালের বুকের মধ্যেটা ফাঁপা হয়ে গেল। গিরি জিভ দিয়ে দাঁতের ফাঁক থেকে মাংসের কুচি বার করতে ব্যস্ত, যেন ভ্যাঙাচ্ছে মনে হয়। পাঁচ টাকার নোটটা সে মৌরীর প্লেটে রাখল। খুচরো আনতে লোকটা চলে গেল। তুলাল দ্রুত হিসাব শুরু করল। তুটাকা বারো আনা গেলে থাকে তুটাকা চার আনা। গাড়ি ভাড়ার জন্য ওটা লাগবে। তাহলে রাইদাকে দেবার জন্য কিছুই তো থাকে না!

লোকটা খুচরো পয়সা আর নোটগুলো প্লেটে করে তুলালের সামনে রাখল। মনে পড়ল আট আনা বখশিশ দেবে বলেছিল। তা দিলে ট্রেন ভাড়ার পয়সা থাকে না। কলকাতা থেকে সিঙ্গুর পর্যন্ত গিরিকে নিয়ে হেঁটে যেতে হবে।

নোট আর পয়সাগুলো তুলাল চটপট পকেটে পুরল। দোকান থেকে বেরোবার আগে উঁকি দিল রাস্তায়। কোথাও রাইদা নেই। উৎফুল্ল হয়ে গিরিকে নিয়ে সে পথে নামল। মিঠে পান কিনে এগিয়েছে আর তখনই রাইদার কণ্ঠস্বর শুনল। ঘুরে দেখে রাস্তার ওপার থেকে ছুটে আসছে। তুলালের ফাঁপা বুকের মধ্যে তাল তাল লোহা পুরে দেওয়া হয়েছে, সে আর নড়তে পারছে না।

রাইদার হাতে প্লাস্টিকের একটা সিঁতুর কৌটো। গিরির সামনে এগিয়ে ধরে বলল, "অদ্দুর থেকে আমার কাছে এলে, খালি হাতে আশীর্বাদ করলুম ভাবতে বড় লজ্জা হল। নাও বৌমা।"

গিরি তাকাল রাইদার দিকে, যেন হাওড়া ব্রিজ বা সেই বিশতলা বাড়িটা দেখছে। রাইদা ওর হাতে কৌটোটা গুঁজে দিল। আপনা থেকেই তুলালের হাত পকেটে চলে গেল। নোট তুটো এগিয়ে দিয়ে বলল, "রাইদা এই নাও।"

দুলালের কানের কাছে মুখ এনে রাইদা বলল, "অনেক দিন পরে আজ গলাটা ভিজবে রে।" বলেই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে গেল।

"চলো।" দুলাল দু'পা গিয়েই থমকে দাঁড়াল, "আচ্ছা বখশিশ কি দিয়েছি?"

"দেখিনি তো।"

পকেট থেকে সব পয়সা বার করে দুলাল গুণল। আগের খুচরো মিলিয়ে মোট তিপ্পান্ন পয়সা। দুলাল ফিরে এল দোকানে।

"আচ্ছা, যে আমাদের খাবার দিল তাকে ডাকুন তো বখশিশ দেওয়া হয়নি।"

লোকটা আসতে দুলাল সব পয়সা তার হাতে তুলে দিল। সে অবাক হয়ে সেলাম জানাল। হাওড়া ব্রীজের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দুলালের মনে হল নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। রেলিং ধরে অন্ধকার গঙ্গার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল। কি লাভ হল, এই কথা দুলাল ভাবল। গুম গুম শব্দ হচ্ছে ট্রাম চলার। পায়ের নীচে ব্রিজটা থরথরিয়ে কাঁপছে। দুলালের মনে হল এত বড় লোহার জিনিসটা যদি ভেঙে পড়ে তাহলে সে মরে যাবে। এখুনি মরতে তার ইচ্ছে নেই। সে বড় গরীব। আরও কয়েকটা বছর বাঁচতে তার বড় সাধ। গিরি ছাড়া তার আর কিছু নেই।

"গিরি কি করে ফিরব? পকেটে যে একটাও পয়সা নেই।"

একথা শুনে গিরিবালা যেন হাওড়া ব্রিজ বা বিশতলা বাড়ি দেখার বিস্ময় নিয়ে দুলালের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, "যখন সেলাম করল, তোমাকে দারোগাবাবুর মত লাগছিল।"

তারপর গিরিকে নিয়ে দুলাল রওনা হল।

বয়সোচিত

"এবার তো ছেলেছোকরাদেরই যুগ এসে গেল। আমি যাচ্ছি, তারপর পবিত্র নাগ যাবে। যারা আঠারো কুড়ি টাকা মাইনেয় ঢুকেছিল সব একে একে যাবে। দুঃখ হবে কেন, জায়গা জুড়ে কি চিরকাল থাকা চলে?" মুখ নামিয়ে গুণেন ঘোষ কাজে মন দিল। আর একটা কথাও সেদিন সে বলে নি।

এর চারদিন পরেই ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বেয়ারার কাছ থেকে সবাই জানল, গুণেন ঘোষ সন্দীপবাবুর পা জড়িয়ে কেঁদে পড়েছিল এক্সটেনশন পাবার জন্য। পায় নি। তিনি বলেছেন, বুড়োহাবড়াদের আর রাখবেনই না। এখন কোয়ালিফায়েড, স্মার্ট ছেলে অজস্র পাওয়া যায়। এবার থেকে নাকি দরখাস্ত নিয়ে ইণ্টারভিউ করে সব চাকরি হবে।

প্রতাপ জানার পক্ষাঘাত হবার পর থেকেই তার ছেলে সন্দীপ কর্ত্তা হয়ে বসেছে। নিজে গাড়ি চালায়, লিফট না পেলে লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় ওঠে। প্রতাপ জানা থাকলে গুণেন ঘোষ যে দু-বছর এক্সটেনশন পেত, সে-বিষয়ে কারুরই দ্বিমত দেখা গেল না। এই বিরাট অফিস আর কারখানা তার একার চেষ্টায় গড়ে তোলার, কর্মচারীদের সঙ্গে তার অমায়িক ব্যবহারের, বিপদে-আপদে অর্থ সাহায্যের কথা ইত্যাদি সবই আলোচিত হল সেদিন।

এরপর থেকেই পবিত্র নাগের রাতের ঘুম কমে গেল। গুণেন

তার থেকে মাত্র সাত মাসের সিনিয়র। পবিত্রর ছেলে বুড়ো এ-বছরই ডাক্তারি পাস করল। রোজগার করে দাঁড়াতে এখনো বছর তিন-চার। একটি মেয়ের বিয়ে হয়েছে, আরো একটির বাকি। রাতে যতক্ষণ না ঘুম আসে কানে শুধু বাজে গুণেনের কণ্ঠস্বর 'তারপর পবিত্র নাগ যাবে।'

ব্যাপারটা একদিন খুলে বলল স্ত্রী উমাকে। শোনামাত্র ফ্যাকাশে হয়ে গেল উমার মুখ। শুধু বলল, "রিটায়ার হলে চলবে কি করে? কটা টাকাই বা আর পাবে। জয়ন্তীর বিয়েতে তো চার হাজার পর্যন্ত তুলেছ।"

উমা পরামর্শ দিল প্রতাপ জানার সঙ্গে দেখা করার। পরদিনই অফিস ছুটির পর পবিত্র হাজির হল মালিকের বাড়ি। ওর মনে পড়ল যখন দর্জিপাড়ার ভাড়াবাড়িতে প্রথম সে প্রতাপ জানার সঙ্গে দেখা করতে যায় পাঁচ বছরের সন্দীপ তাকে বলেছিল, "বসুন, ডেকে দিচ্ছি।"

প্রায় পনেরো মিনিট পর চাকর এসে পবিত্রকে নিয়ে গেল দোতলার ঘরে। দেড় বছরেই দশাসই মানুষটি কঙ্কালসার হয়ে গেছে। বাঁদিক একদম পড়ে গেছে। কথা যা বলেন বোঝা যায় না। ডান হাত কোনোরকমে তুলে ওকে বসতে বললেন। চেয়ারটা খাট ঘেঁষে টেনে পবিত্র বসল।

প্রায় আধঘণ্টা চুপ করে বসে পবিত্র বাড়ি ফিরল। উমা ব্যগ্র হয়ে জানতে চাইল, উনি কিছু করবেন বলে কথা দিলেন কিনা। পবিত্র ভারি অসহায় বোধ করল। যার নড়াচড়ার বা কথা বলারই ক্ষমতা নেই তাকে কি এইসব ব্যাপার জানানো যায়। উমার মুখ দুশ্চিন্তায় কালো হয়ে গেল।

দিন-তিনেক পর রাতে উমা এসে বসল পবিত্রর বিছানায়। ফিসফিস করে বলল, "সন্দীপবাবুর সামনে চটপটে ভাব দেখিয়ে ঘোরাঘুরি করো না। তোমাকে তো খুব বুড়ো আর দেখায় না।"

"তা কি করে হয়। ওতে কি বয়স কমে?"

"কেন হবে না। ওপরের পাঁচুদাসবাবুর তো সব চুল পাকা, বুঝতে পারবে দেখলে? আর কেমন সিধে হয়ে হাঁটে।"

"ওতো এককালে ফুটবল খেলত, স্বাস্থ্যটা এখনো ভালো। তাছাড়া প্যাণ্ট পরলে অনেক স্মার্ট দেখায়।"

"তুমিও পরবে। বুড়োর প্যাণ্ট তোমারও হবে। দরকার হলে দর্জির কাছ থেকে ছোট করিয়ে আনবে।"

পরের সোমবারই চুলে কলপ দিয়ে, ছেলের প্যাণ্ট এবং নতুন বুটজুতো পরে পবিত্র অফিসে এল। দেখে সবাই হাসল, ঠাট্টা করল। দু-একজন ঘুরিয়ে এমন কথাও বলল, রিটায়ারের সময় আসছে বলেই ছোকরা সেজেছে। পবিত্র এ-সবের কিছুই গ্রাহ্য করল না। শুধু খুঁটিয়ে লক্ষ করতে লাগল অল্পবয়সীদের চলাফেরা রকমসকম।

নতুন জুতোর তলায় ভালো করে ধুলোও লাগে নি। এখনো চলতে গেলে পা হড়কায়। তাই পা টিপে টিপে পবিত্র অফিসের সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। হঠাৎ ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে উঠে আসতে দেখে হকচকিয়ে প্রায় ছুটেই সে নামতে শুরু করল। সিঁড়িটা যেখানে ঘুরেছে তার শেষ ধাপের তিনটি সিঁড়ি উপর থেকে পবিত্র লাফ দিল। হাঁটু নুয়ে পড়ছিল, টাল সামলে উঠতে গিয়ে জুতো পিছলে গেল। ম্যানেজিং ডিরেক্টরই ওকে টেনে তুলল। এবং বেশ সহানুভূতির সঙ্গেই বলল, "সাবধানে নামা-ওঠা করুন। এই বয়সে হাত পা ভাঙলে আর সারবে না!"

শুনে পবিত্র বিমর্ষ হয়ে পড়ল। বহুক্ষণ ভাবল 'এই বয়সে' বলতে কি বোঝাল? বুড়ো হয়েছি অর্থাৎ শারীরিক অক্ষমতার ইঙ্গিত দিল কি? 'এই বয়সে' মানে কি ষাট বছর বয়স! রাতে উমার কাছে পবিত্র ঘটনাটা বিবৃত করল। ক্ষুব্ধ হয়ে উমা বলল, "নিশ্চয় তোমার বয়সকে ঠেস দিয়েই বলেছে। হয়তো রিটায়ারের

সময় এই ঘটনাটার কথাই ওর মনে পড়বে তখন আর চাকরি বাড়াতে চাইবে না। কেন ওভাবে নামতে গেলে?"

"ওভাবেই তো সুধেন্দুকে নামতে দেখি।"

পরদিনই উমা আঁশবঁটি দিয়ে জুতোর তলা ঘষে দিল। জুতো পরে চেয়ার থেকে পবিত্র বার পাঁচ-ছয় লাফিয়ে নামল। অফিস বেরোবার সময় ফিসফিস করে উমা বলে দিল, "এখন কিছুদিন একদম সামনাসামনি হবে না। ভুলে যেতে দাও। বড় বড় ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় তো, ছোট ব্যাপার আর কদিনই বা মনে করে রাখবে।"

পবিত্র প্রাণপণ করে চলল যাতে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে তার দেখা না হয়। মাসখানেক পর সন্দীপ জানা তাদের ঘরে ব্যস্ত হয়ে ঢুকে বিল-ইনচার্জ প্রভাকরের সঙ্গে টেবলে হাত রেখে ঝুঁকে কথা বলতে শুরু করল। পবিত্রর টেবলে তখন চায়ের কাপ আর মুখে টোস্ট। ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে দেখেই বিষম খেল। খক খক করে কাসতে শুরু করল। সন্দীপ ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই পবিত্র দম বন্ধ করল কাসি চাপতে। চোখ দুটো ঠিকরে পড়ার দশা, মুখের খাবার গিলবার জন্য কোঁত পাড়ল। ঘরের সকলেই তার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসছে। সন্দীপ খুব সহানুভূতির সঙ্গেই বলল, "আপনার কি কাসির অসুখ আছে? আমাদের ডাক্তারকে দেখিয়ে নিন না।"

পবিত্র জোরে মাথা নাড়তে থাকল।

বাড়ি ফিরে পবিত্র ঘটনাটার কথা উমাকে বলল না, শুধু 'কাসির অসুখ' কথাটা তার মনে পাক খেয়ে ফিরতে লাগল। কি বোঝাতে চাইল? কাসিটা কি যক্ষ্মারোগীদের মতো ছিল? এটা কি ও মনে করে রাখবে? যদি রাখে তাহলে এক্সটেনশন কি পাওয়া যাবে?

কিছুদিন পর অফিসে একটা চাপা উত্তেজনা দেখা গেল।

স্পোর্টস হবে। ইতিপূর্বে কখনো হয় নি। এক ছোকরা সহকর্মী পবিত্রকে পরামর্শ দিল, "দাদা, বুড়োদের জন্য ওয়াকিং রেস আছে, নেমে পড়ুন। সন্দীপবাবু প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউট করবেন। যদি ফার্স্ট-সেকেণ্ড হন, নজরে পড়বেন। আপনি যে ফিজিক্যালি ফিট সেটা তো প্রমাণ হবে।"

কথাটা মনে লাগল। উমাকে বলামাত্রই সে সায় দিল।

"কতটা হাঁটতে হবে ?"

"তা প্রায় আধ মাইল।"

"পারবে না ?"

পবিত্র কাঁচুমাচু হয়ে বলল, "খুব জোরে হাঁটতে হবে। ফার্স্ট-সেকেণ্ড না হলে লাভ কি ?"

"তা তো বটেই। কাল থেকেই জোরে হাঁটা অব্যেস কর। আমি বরং ভোরবেলা তুলে দেব। পার্কে গিয়ে হাঁটবে।"

পবিত্র পরদিন থেকে হাঁটার অভ্যাস শুরু করল। আলো ফোটার আগেই উমা তাকে তুলে দেয়। পার্কে গিয়ে কয়েক চক্কর হেঁটে বেঞ্চে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে বাড়ি ফিরে আসে। একদিন উমা বলল, "চলো আমিও যাই। দেখব তুমি কেমন হাঁটতে পার।"

পার্কের বেঞ্চে উমা বসে রইল। পবিত্র একপাক দিয়ে তার সামনে আসামাত্র বলল, "এ তো বেড়ান হচ্ছে। এভাবে চললে কি ফাস্ট সেকেন হওয়া যায় ?"

পবিত্র চলার বেগ বাড়াল। তিনপাক দেবার পর হাঁফিয়ে উঠে, উমার পাশে এসে বসল।

"আধ মাইল হয়ে গেল !"

"আর পাচ্ছি না।"

"তাহলে হবে কি করে ? বুড়োকে ডাক্তারখানা করে দিয়ে বসাতে হবে ; বাসন্তীর বিয়ে এই বছরই দেব ; আর বলছ পাচ্ছি না ? ওঠো ওঠো। আর দিন-পনেরো মোটে সময়।"

পবিত্র জোরে আরো তিনপাক হেঁটে এসে বসল। পা কাঁপছে। হাঁ করে শ্বাস নিতে নিতে উমাকে বলল, "এভাবে কি জোয়ান সাজা যায়!"

উমা কথা না বলে সামনে তাকিয়ে থাকল। পবিত্র হাঁটুতে হাত রেখে ঘাড় নিচু করে কিছুক্ষণ হাঁফাবার পর আস্তে আস্তে বলল, "এতখানি বয়েস হল তার আর কোনো দাম রইল না।"

এরপর থেকে রোজই উমা সঙ্গে আসে। পবিত্র চক্কর দিতে থাকে। যখন কাছে আসে উমা গলা এগিয়ে ফিসফিস করে, "জোরে। আরো জোরে।" পবিত্র তাই শুনে হাঁটার জোর বাড়ায়। কখনো কখনো উমাও হাঁটে ওর সঙ্গে। কিছুটা গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। পবিত্র চক্কর সম্পূর্ণ করে এলে আবার কিছুটা সঙ্গে থাকে। রাতে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে সে পবিত্রর পা টিপে দেয়।

স্পোর্টসের দিন পবিত্রর সঙ্গে উমাও মাঠে গেল। সামিয়ানা খাটানো হয়েছে। অ্যামপ্লিফায়ারে গানের রেকর্ড বাজছে। কর্মকর্তারা তদারকিতে ব্যস্ত। পবিত্র আর উমা একধারে দুটি চেয়ারে বসে রইল। বিরাট এক টেবলে পুরস্কারগুলি সাজানো। উমা বলল, "কোন্‌টা তোমাদের?"

"কি জানি! শুনেছি অ্যাটাচি ব্যাগ দেবে।"

"তাহলে বুড়োর কাজে লাগতে পারে।"

পবিত্র মুখ ফিরিয়ে স্পোর্টস দেখতে লাগল। সকাল থেকে উমা কিছু খেতে দেয়নি। তেষ্টায় বুক শুকিয়ে যাচ্ছে। কোকা কোলা বিলানো হচ্ছে প্রতিযোগীদের। পবিত্র উঠে পড়ল। গুটি গুটি এগোতেই উমা পিছু নিল।

"জল খেতে যাচ্ছি।"

"বেশী খেওনা।"

উমা চেয়ারে এসে বসল। পবিত্র দু-বোতল কোকা কোলা শেষ

করে তৃপ্তি বোধ করল। ফুরফুরে হাওয়া, রোদটাও মিঠে লাগছে তাই সে ইতস্তত বেড়াতে লাগল। দূরে দূরে ঘেরা ফুটবল মাঠ। মাঝে মাঝে ক্লাবের তাঁবু। অনেক মাঠেই ক্রিকেট খেলা চলছে। এধারে মনুমেণ্ট, ওধারে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। ট্রামগুলো খেলনার গাড়ির মতো। পবিত্র কিছুক্ষণ দূরের ট্রাম-বাসের চলা দেখল। একজায়গায় অনেক লোক ভিড় করে। এগিয়ে গেল সে। ম্যাজিক দেখাচ্ছে দাঁতের মাজনের ফিরিওলা।

অবাক হয়ে সে মাজনওলার বক্তৃতা শুনছিল। হাতে টান পড়তেই ফিরে দেখে উমা।

"এখানে দাঁড়িয়ে থাকলেই কি চলবে? সন্দীপবাবু এইমাত্র এল, যাও সামনে গিয়ে দাঁড়াও। কত লোক তো ঘুরঘুর করছে, কথা বলছে।"

গজগজ করতে করতে উমা ওকে নিয়ে ফিরে এল সামিয়ানার কাছে। সন্দীপ জানা হেসে হেসে কথা বলছে, কর্মচারীর ছেলে-মেয়েদের পিঠ চাপড়াচ্ছে, গাল টিপছে। পবিত্র ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একজন বলল, "পবিত্রবাবু আজ ওয়াকিং রেসের সব থেকে ভেটারেন কম্পিটিটর।"

"তাই নাকি!" ম্যানেজিং ডিরেক্টর খুব অবাক হল, "তাহলে তো আপনাকে জিততেই হবে। যদি জেতেন আপনাকে আমি একটা স্পেশাল প্রাইজ দেব।"

পবিত্র কাছে আসতেই উমা ঝাঁপিয়ে পড়ল যেন। "কি, কি বলল?"

"যদি জিতি, স্পেশাল প্রাইজ দেবে আমাকে।" পবিত্রর কণ্ঠে উমার মতো উত্তেজনা নেই।

"তাহলে তো জিততেই হবে তোমাকে। ওঃ রাধামাধব! এই-বারটি অন্তত মুখ তুলে চাও। সারাজীবনই তো জ্বালাতন-পোড়াতন হলুম।" উমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। ফোঁপানি চাপতে

মুখে আঁচল দিল! ম্যাজিকওলাকে ঘিরে এখনো ভিড় জমে আছে। পবিত্র সেইদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল।

সবশেষে ওয়াকিং রেস। মাঠটা গোল হয়ে তুটো চক্কর দিতে হবে। দর্শকরা চেয়ার থেকে উঠে এসে লাইনের ধারে জড়ো হয়েছে মজা দেখতে। প্যান্টটাকে হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে পবিত্র প্রতিযোগীদের সঙ্গে দাঁড়াল। অফিস এবং কারখানা মিলিয়ে পনেরোজন। সকলে পঁয়তাল্লিশ বছরের উপরে। দর্শকরা উৎসাহ দিয়ে কথা বলছে। উমা শুধু একধারে ঠায় দাঁড়িয়ে।

পিস্তল ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল হাঁটা। দর্শকদের মধ্যে হৈ হুল্লোড়। অনেকে প্রতিযোগীদের সঙ্গে লাইনের পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগল চীৎকার করতে করতে। প্রথম চক্করে সিকি পথ পবিত্র সবার আগে! মাঝপথে দেখা গেল তিন-চারজনের পিছনে। চক্করটা শেষ হবার আগেই পিছনের লোকেরা ওকে ধরে ফেলল। দর্শকদের চীৎকারে দূরের পথিকরাও একবার থমকে এদিকে তাকাল।

পবিত্র অসহায় বোধ করল। পাশের লোকটি তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। উমা কোথায়, তাই দেখতে গিয়ে চোখ পড়ল ম্যানেজিং ডিরেক্টর হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিচ্ছে অগ্রবর্তীদের। পবিত্র দমে গেল। খালি পেট মোচড় দিচ্ছে। ঘাড়টা কাত হয়ে পড়েছে। হাত তুটো পাঁজরের তুপাশে গাছের ভাঙা ডালের মতো তুলছে। সামনের লোকেদের সঙ্গে তার ব্যবধান বেড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ সে চমকে উঠল উমাকে দেখে। লাইনের পাশে সর্বস্বান্তের মতো দাঁড়িয়ে।

"এইভাবে তুমি ডোবাবে।" উমাও ওর সঙ্গে পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করেছে আর তিক্ত হতাশ কণ্ঠে বলছে, "সবাই এগিয়ে যাচ্ছে। এগোও। আরো জোরে হাঁটো, আরো জোরে, এই তো, এই তো।"

চিবুক তুলে, নিঃশ্বাস টেনে পবিত্র জোরে হাঁটতে চেষ্টা করল।

মাথা নড়ছে ছ্যাকরা গাড়ীর টাল-খাওয়া চাকার মতো। দুটো হাত লগবগ করছে। গোটা শরীর আলোড়িত হয়ে হাস্যকর দৃশ্য তৈরি করল। তবে ওর আগের লোকের সঙ্গে ব্যবধান কয়েক মিটার কমল।

উমা তাল রাখতে ছুটতে শুরু করেছে। আর চাপাস্বরে বলে চলেছে, "এই তো, এই তো! সবাই দেখছে, সন্দীপবাবু দেখছে। কে বলে তোমার বয়স হয়েছে? কে বলে বুড়ো হয়েছ?"

মাঠের দর্শকরা এতক্ষণ নাগাড়ে চীৎকার করে যাচ্ছিল। এখন তারা হঠাৎ চুপ করে, পবিত্র আর উমাকে দেখতে লাগল। কথা বলার দরকার হলে ফিসফিস করছে। পবিত্র দ্বিতীয় চক্করের অর্ধেক পার হয়েছে। প্রথমজন ফিতের দিকে এগোচ্ছে।

"সব্বোনাশ হল! পৌঁছে গেছে যে গো।" উমা দাঁড়িয়ে পড়ল। তখন পবিত্র মরিয়া হয়ে হঠাৎ ছুটতে শুরু করল। প্রতিযোগীরা অবাক হয়ে কেউ কেউ থমকে দাঁড়াল। এতক্ষণ সারা মাঠ একটা কিছুর প্রত্যাশায় দম বন্ধ করেছিল। এবার হৈ হৈ করে চীৎকার, হাততালি আর হাসি শুরু করল। পবিত্র সবার আগে ফিতে ছিঁড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে, ম্যানেজিং ডিরেক্টরের দিকে তাকিয়ে হাসল।

লাউডস্পীকারে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা হচ্ছে। হাততালি পড়ছে। পবিত্র আর উমা তখন অবসন্নগতিতে ধর্মতলার ট্রাম টার্মিনাসের দিকে হেঁটে চলেছে। কেউ কথা বলছে না। পবিত্র একটু পিছিয়ে। মাঝে মাঝে মুখ তুলে দু-ধারে তাকাচ্ছে। প্যাণ্টটা তখনো হাঁটু পর্যন্ত গোটানো।

ট্রামে উঠে পবিত্র উমার সীটের পিছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। উমা তাকে বসতে বলল না।

পরদিন ধুতি-পাঞ্জাবি পরে, পবিত্র অফিসে গেল। ফিরে এল দুপুরে। উমা বিস্মিত হয়ে তাকাবামাত্র সে বলল, "আর রিটায়ার করাতে পারবে না। রিজাইন দিয়ে এলুম।"

প্রত্যাবর্তন

লোকটা আজও এসেছে। এই নিয়ে পরপর পাঁচদিন।

“কি জন্য আসে বল্‌তো এই ভোরবেলায়?” পল্টুকে বললাম। “কাল দেখছিলাম আমাদের দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে আবার হাসছিলও।”

ফুটবলটা মাটিতে ধাপাতে ধাপাতে পল্টু নিমগাছতলাটার দিকে তাকাল। লোকটা ওইখানে বসে রয়েছে। ওইখানেই আমরা পোষাক বদলাই, বুট পরি ও খুলি, প্র্যাকটিসের পর বিশ্রাম নিই, সঙ্গে নিয়ে আসা খাবার খাই। এত ভোরে কারখানার এই মাঠটায় আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ আসে না। অবশ্য আসার উপায়ও নেই। সারামাঠ পাঁচিলে ঘেরা। শুধু এক জায়গায় পাঁচিলটা ভাঙা। শ্রম ও সময় বাঁচাবার জন্য আমরা সেই ভাঙা জায়গা দিয়েই মাঠে ঢুকি। মাঠ থেকে লোকালয় প্রায় সিকি মাইল দূরে। এ তল্লাটে চার-পাঁচ মাইলের মধ্যে ফুটবল খেলার এতবড় মাঠ আর নেই। আমার দূরসম্পর্কের এক আত্মীয় এই লোহা-কারখানার ফোরম্যান। তার সুপারিশে ম্যানেজারের কাছ থেকে অনুমতি পেয়েছি, সকালে প্র্যাকটিসের। এ বছর থেকে আমরা দুজনেই ফার্স্ট ডিভিশনে খেলব তাই উৎসাহটা বেশিই। গরম পড়তে না পড়তেই প্র্যাকটিস শুরু করে দিয়েছি।

“পাগল-টাগল হবে বোধহয়।” পল্টু এর বেশি কিছু বলল না।

গাছতলায় দুজনের ব্যাগ আর বলটা রেখে লোকটাকে গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে আমরা প্রায় নগ্ন হয়েই খাটো প্যান্ট পরলাম। বুট পরতে পরতে একবার তাকালাম খোঁচা খোঁচা আধপাকা দাড়িওয়ালা, অপরিচ্ছন্ন শীর্ণকায় আধবুড়ো লোকটির দিকে। দুজনেই ঘড়ি খুলে ব্যাগে রেখেছি। আমরা মাঠের মধ্যে থাকব আর এই লোকটা থাকবে ব্যাগ দুটোর কাছে, মনে হওয়া মাত্র অস্বস্তি বোধ করলাম। ঘড়ি পরেই থাকব কি না ভাবলাম। পল্টুর পক্ষে অবশ্য সম্ভব নয় কেননা সে গোলকীপার খেলে। ওকে প্রায়ই মাটিতে ঝাঁপ দিতে হয়। লোকটাকে যে অন্য কোথাও বসতে বলব, তাতেও বাধো বাধো ঠেকল। ওর সর্বাঙ্গে দারিদ্র্যের তকমা আঁটা থাকলেও, বসার ঋজু ভঙ্গিতে ঝকঝকে চাহনিতে বা গ্রীবার উদ্ধত বঙ্কিমতায় এমন একটা সহজ জমকালো ভাব রয়েছে, যেটা ছিঁচকে-চোর সম্পর্কে আমার ধারণার সঙ্গে একদমই মেলাতে পারলাম না।

লোকটি শিশুর কৌতূহল নিয়ে আমাদের বুটপরা দেখছে। এই ক'দিন খয়েরি লুঙ্গি আর সাদা হাওয়াই শার্ট পরে আসছিল, আজ দেখি পরনে ঢলঢলে কিন্তু ঝুলে খাটো, মোটা জিনের নীল পাজামা। বয়লার বা মেসিনঘরের শ্রমিকরা যেরকমটি পরে। চকোলেট রঙের কলার দেওয়া ফ্যাকাসে হলুদ রঙের সিল্কের যে গেঞ্জিটা পরেছে সেটাও ঢলঢলে। মনে হয় অন্য কারুর পাজামা ও গেঞ্জি পরে এসেছে।

"আপনারা অ্যাংক্লেট পরলেন না যে?" লোকটির হঠাৎ প্রশ্নে আমরা দুজনেই মুখ ফেরালাম। পল্টু গম্ভীর স্বরে বলল, "পরার কোন দরকার নেই, তাই। ওতে সুবিধের থেকে অসুবিধেই বেশি হয়।"

লোকটির চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। আমাদের পায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "কে বলল সুবিধে হয় না, পরে কখনো খেলেছেন?"

কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করেই আবার বলল, "বড় বড় প্লেয়াররা সবাই অ্যাংক্লেট পরেই খেলেছে—সামাদ, ছোনে, জুম্মা, করুণা—কই ওদের তো অসুবিধে হয়নি! ওদের মতো প্লেয়ারও তো আর হল না।"

"আর হবেও না কেননা খেলার ধরনই বদলে গেছে।" এবার আমিই জবাব দিলাম।

"গেলেই বা! শুটিং, হেডিং, ড্রিবলিং ট্যাকলিং, পাসিং, এসব তো আর বদলায়নি!" লোকটি মিটমিট করে হেসে আবার বলল, "আজকাল হয়েছে শুধু রকমারি গালভরা নামগুলা সব আইডিয়া। সেদিন এক ছোকরা আমায় ফোর-টু-ফোর বোঝাচ্ছিল। আরে এতো দেখি সেই আমাদের আমলের টু-ব্যাকেরই খেলা! হাফ-ব্যাক দুটো নেমে এলেই তো ফোর ব্যাক—"

ওর কথা শেষ হবার আগেই আমি আর পল্টু নিজেদের মধ্যে চাওয়া-চাওয়ি করে মাঠে নেমে পড়েছি। রোজই প্রথমে আমরা মাঠটাকে চক্কর দিয়ে কয়েক পাক দৌড়ই। শুরু করার আগে পল্টু চাপা স্বরে বলল, "গুলিখাওয়া বাঘ। অ্যানাদার ফ্রাসট্রেটেড ওল্ড ফুটবলার।"

পাশাপাশি ছুটতে ছুটতে ঘাড় ফিরিয়ে দুজনেই লক্ষ করছিলাম লোকটাকে। এক সময় দুজনেই থেমে পড়লাম। বলটা গাছতলাতে রেখে আমরা দৌড়তে নেমেছি। ইতিমধ্যে সেটিকে নিয়ে লোকটা কাল্পনিক প্রতিপক্ষদের কাটাতে ব্যস্ত। প্রায় ছ'ফুট লম্বা লগবগে শরীরটাকে একবার ডাইনে আবার বাঁয়ে হেলাচ্ছে, পায়ের চেটো দিয়ে বলটাকে, টানল, বলটাকে লাফিয়ে ডিঙিয়ে গেল, ঘুরে গিয়ে প্রচণ্ড শট করার ভাণ করে পা তুলে আলতো শটে বলটা ডানদিকে ঠেলে দিয়ে ঝুঁকে যেন সামনে দাঁড়ান কাউকে এড়িয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে দেখতে লাগল বলটা

গোলে ঢুকছে কিনা। বলটা গড়াতে গড়াতে থেমে যেতেই দু'হাত তুলে হাসতে শুরু করল। মনে হল প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের ভ্যাব্‌চ্যাক মুখগুলো দেখে হাসি সামলাতে পারেনি।

পল্টুকে বললাম, "বোধহয় এককালে খেলত।"

নকল আতঙ্ক গলায় ফুটিয়ে পল্টু বলল, "সেরেছে। মিলিটারিদের সঙ্গে খেলার গপ্পো শুরু করবে না তো!"

"তোর এইসব বাজে ধারণাগুলো মাথা থেকে তাড়া।" ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললাম, "সে আমলে সত্যিই অনেক ভাল ভাল প্লেয়ার ছিল।"

"হ্যাঁ ছিল। গোরারা তাদের ভয়ে ঠকঠক কাঁপত। তারা তিরিশ-চল্লিশ গজ দূর থেকে মেরে মেরে গোল দিত। রেকর্ডের খাতা খুলে ছাখ সেই সব শটের কোন পাত্তাই মিলবে না। বড়জোর এক গোল কি দুগোল, আর বাবুরা খেতেন পাঁচ-ছ গোল।" এই বলে পল্টু আমার জন্য অপেক্ষা না করেই আবার ছুটতে শুরু করল।

আমি মাঠের বাইরে লোকটার দিকে তাকালাম। এক পায়ে দাঁড়িয়ে অন্য পায়ে বলটাকে মেরে মেরে শূন্যে রাখার চেষ্টা করছে। তিন-চার সেকেণ্ডের বেশি পারছে না। অবশেষে বিরক্ত হয়ে বলটাকে লাথি মেরে মাঠের মাঝখানে পাঠিয়ে দিল। যখন শুটিং প্র্যাকটিস শুরু করলাম লোকটা মাঠে এসে দাঁড়াল। কারখানার মেল্টিং শপের দেয়ালটায় খড়ির দাগ টেনে পোস্ট এঁকে নিয়েছি। ক্রশবারটা কাল্পনিক। যে সব বল পল্টু ধরতে পারেনা, দেয়ালে লেগে মাঠে ফিরে আসে। লোকটা তুমুল উৎসাহে ছোটাছুটি করে সেই বল ধরে, যেন ছাত্রদের সামনে শুটিং-এর টেকনিক বোঝাচ্ছে এমন কায়দায় পা দিয়ে মেরে আমায় ফিরিয়ে দিতে লাগল আর সামনে বকবক করে চলল।

"উঁহুঁ, উপর দিয়ে নয়, মাটিতে, সবসময় মাটিতে রাখতে হবে....উপর তোলা মানেই গেল, নষ্ট হয়ে গেল!" উর্ধ্বশ্বাসে বলা

ধরতে ছুটে গেল। "আজকাল তো সেইসব ক্ল্যাসিক থ্রু পাশ দেখতেই পাই না, কুমারবাবু দিতেন।" আবার ছুটে গেল। "সেদিন ছোকরাটাকে বলছিলুম, যে ফোর-টু-ফোর বোঝাচ্ছিল.... আরে বাবা ছক কষে কি ফুটবল খেলা হয়...মাটিতে মাটিতে, তুলে নয়...হ্যাঁ এখন অনেক বেশি খেলতে হয় বটে, সে কথা আমি মানি, খাটুনি বেড়েছে....হলনা হলনা থ্রু দেবার সময় পায়ের চেটোটা ঠিক এইভাবে, দিন বলটা আমায় দিন দেখিয়ে দিচ্ছি।"

বলটা ওকে দিলাম। দূর থেকে পল্টু খিঁচিয়ে উঠল, "আমি কি হাঁ করে ভ্যারেণ্ডা ভাজব? শট কর শট কর।"

লোকটি অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি বলটা আমার দিকে ঠেলে দিল। "দমাদম গোলে বল মারলেই কি ফুটবল খেলা হয়, স্কিল্ও প্র্যাকটিস করতে হয়।" এই বলে লোকটি ক্ষোভ প্রকাশ করল বটে কিন্তু বল ধরে ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ বন্ধ করল না। পা ফাঁক করে কুঁজো হয়ে দৌড়ে, বলটাকে ধরেই কাউকে যেন কাটাচ্ছে এমন ভঙ্গিতে পায়ে খেলিয়ে নিয়ে যেন মহার্ঘ একটি পাস দিচ্ছে, আমার সামনে বলটা বাড়িয়ে দিয়ে চীৎকার করল, "শ্যুট শ্যুট।" গড়ানে বলেই শট করলাম, ঝাঁপিয়ে পড়া পল্টুর বগলের তলা দিয়ে বলটা প্রচণ্ড গতিতে দেয়ালে লেগে মাঠে ফিরে এল। "গো-ও-ল...ল।" বলে লোকটি হাত তুলে লাফিয়ে উঠল। শট্‌টির নিখুঁতত্বে আমি তখনও চমৎকৃত। লোকটি উত্তেজিত স্বরে চেঁচিয়ে বলল, "কাকে থ্রু বলে দেখলেন তো। আর এই জিনিস আপনারা খেলা থেকে কিনা তুলে দিয়েছেন! আজকাল কি যে ম্যান-টু-ম্যান খেলা হয়েছে, বিউটিই যদি না থাকে তাহলে—"

আমি দেখলাম পল্টু মুখ লাল করে ছুটে আসছে। শিউরে উঠলাম। পল্টুর মাথা অল্পেই গরম হয়। সামান্য উস্কানিতেই ঘুঁষোঘুঁষি শুরু করে।

"আমরা এখানে এসেছি প্র্যাকটিস করতে," ভারী গলায়

প্‌ল্টু বলল। "আপনাকে তো আমরা ডাকিনি তবে কেন গায়ে পড়ে ঝামেলা করছেন। খেলা যদি শেখাতে চান, তবে অন্য কাউকে ধরে শেখান। প্লিজ আমাদের বিরক্ত করবেন না।"

পল্টু গটগট করে ফিরে গেল নিজের জায়গায়। লোকটি অবাক হয়ে পল্টুর দিকে তাকিয়েছিল। দেখলাম ক্রমশ মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে এল। মাথা নামিয়ে গাছতলার দিকে যখন ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ওর ঢলঢলে নীল পাজাম আর কুঁজো পিঠটার দিকি তাকিয়ে ক্ষয়ে যাওয়া শ্যাওলাধরা একটা পাথরের কথাই মনে এল। আমরা যখন নিমগাছতলায় বসে খাচ্ছিলাম, লোকটি তখন উঠে গেল। খেতে খেতে পল্টু শুরু করল আমাদের নতুন ক্লাবের ফুটবল সেক্রেটারীর মেয়ের গল্প। নিয়মিত খেলা দেখে। প্লেয়ারদের সঙ্গে এখানে-ওখানে ঘোরে এবং কার কার সঙ্গে তাকে কোথায় কখন দেখা গেছে, পল্টু যখন তার ফিরিস্তি দিচ্ছিল তখন হঠাৎ চোখে পড়ল লোকটি ধীরে ধীরে ছুটতে শুরু করেছে মাঠটাকে পাক দিয়ে। ঠিক আমরা যেভাবে ছুটি। আমার সঙ্গে পল্টুও অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল।

একপাক শেষ করে যখন আমাদের সামনে দিয়ে ছুটে গেল, দেখি জ্বলজ্বলে চোখ দুটি কঠিন দৃষ্টিতে সামনে নিবদ্ধ। আমাদের দিকে বারেকের জন্যও তাকাল না। সরু বুকটা হাপরের মত ওঠানামা করছে। নিঃশ্বাস নেবার জন্য মুখটা খোলা। পিছন থেকে শীর্ণ ঢ্যাঙা দেহের উপরে কলির পোঁচড়ার মত চুল ভর্তি মাথাটাকে নড়বড় করতে দেখে হাসিই পেল। কিন্তু পরক্ষণেই কষ্ট হল আধবুড়ো লোকটির ওই ধরনের ছেলেমানুষী প্রয়াস দেখে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ও নিজেকে আমাদের সমান প্রতি-পন্ন করতে যেন চ্যালেঞ্জ দিয়েই ছুটছে বয়সের বাধা ঠেলে ঠেলে। মনে মনে চাইলাম ছেলেমানুষের মত এই অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতা ত্যাগ করে এখান থেকে ও চলে যাক।

"টেঁসে না যায়, তাহলে আবার হুজ্জুতে পড়তে হবে।" পণ্টুর স্বরে সত্যিকারের উৎকণ্ঠা কিছুটা ফুটল। লোকটা দেড় পাক ছুটেই দাঁড়িয়ে পড়েছে। মুখ তুলে হাঁ করে আছে। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। মনে হল আমাদের দিকে বারকয়েক আড়চোখে তাকালও। হয়তো কোলাপ্‌স করে পড়ে যেতে পারে ভেবে আমি উঠে দাঁড়ালাম। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক হাঁটার ভঙ্গিতে পাঁচিলের ভাঙ্গা জায়গাটার দিকে এগিয়ে গেল। তাই দেখে আবার কষ্ট পেলাম। পণ্টু হো হো করে হেসে উঠল।

দিন ছয়-সাত লোকটি এল না। আশ্বস্ত হয়ে ভাবলাম আর বোধহয় আসবেনা। কিন্তু লোকটি এল, সঙ্গে তিন-চারটি তালিমারা ঢ্যাবঢেবে একটি ফুটবল নিয়ে। আমরা যথারীতি প্র্যাকটিস করতে লাগলাম আর তখন সে মাঠের অপরদিকে নিজের বলটি নিয়ে কাল্পনিক প্রতিপক্ষদের নাজেহাল করায় ব্যস্ত রইল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই দেখলাম, বলটিকে পায়ের কাছে রেখে সে আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। একবার বলটা ওর দিকে গড়িয়ে যেতেই চোখদুটো চকচক করে উঠল। সামনে ঝুঁকে এগোতে গিয়েও প্রাণপণে নিজেকে যেন ধরে রাখল।

"ক'দিন দেখিনি যে আপনাকে?" বললাম নিছকই সৌজন্য-বশত।

"শরীরটা খুব খারাপ হয়েছিল।" গম্ভীর হয়ে বলার চেষ্টা করল।

ওকে খুশি করার জন্য বললাম, "দেখুন তো থ্রুগুলো ঠিক মত হচ্ছে কিনা।"

একটু পরেই ও চেঁচিয়ে উঠল, "ওকি ওকি! হচ্ছে না।" আমি ফিরে তাকাতেই আবার বলল, "চটপট করতে হবে, কিন্তু কম স্পীডে। কিক্‌ করার সময়ও তাই। পায়ের পাতার ওপর দিক দিয়ে। বুটের ডগা মাটির দিকে—এইরকম ভাবে। তারপর ফলো-থ্রুটা হবে—এই রকম! করুন তো একবার।"

ফার্স্ট ডিভিশ্যনে খেলতে যাচ্ছি আর এখন কিনা শ্যুট করার প্রাথমিক নিয়ম এইরকম একটা লোকের কাছ থেকে শিখতে হবে ভাবতেই বিরক্তিতে মন ভরে উঠল। ওকে অগ্রাহ্য করে আগের মতনই শ্যুট করতে লাগলাম। বার দুয়েক চেঁচিয়ে ও চুপ করে গেল। বুঝতে পারছি লোকটির একজন চেলা দরকার, যে ওর উপদেশ শুনবে, মান্য করবে, আমরা যে ওর কথা অনুযায়ী কাজ করবনা সেটা নিশ্চয় বুঝে গেছে।

পরদিন সকালে বৃষ্টি পড়ছিল। আমরা মাঠে এসে দেখি চেলা জুটে গেছে। থপথপে বোকা চেহারার একটা ছেলে বৃষ্টির মধ্যে কাঠের মত দাঁড়িয়ে, বল নিয়ে লোকটার লম্ফঝম্ফ মনযোগ করে দেখছে। ওর পাগলামি আর উৎসাহ দেখে অবাক হলাম। কিন্তু বৃষ্টির জল গায়ে বসবার স্বাস্থ্য বা বয়স ওর নয়। পল্টুকে বললাম, "নির্ঘাৎ নিউমোনিয়া হবে লোকটার।"

"হোক্। কিন্তু এটাকে কোত্থেকে ধরে আনল, একটা হাঁদা গোবর-গণেশ! সারা জীবনেও তো খেলা শিখতে পারবে না।"

দূর থেকেই আমরা শুনতে পেলাম লোকটির নির্দেশ দেওয়া। যেন ক্লাস লেকচার দিচ্ছে। "বলের উপর দিয়ে যদি এইভাবে যাও"—ছোট্ট একটা লাফ—"তাহলে কিস্সু হবে না। তোমায় করতে হবে কি এইভাবে....তারপর এইভাবে নিয়ে যাবে। তাহলে দোনামনায় পড়বে তোমার অপোনেন্ট।"

ছেলেটি একাগ্র হয়ে দেখছে আর প্রত্যেক কথায় ঘাড় নেড়ে যাচ্ছে কিন্তু লোকটি ওকে বল নিয়ে চেষ্টা করতে বলছে না। "এইবার দেখাচ্ছি কিভাবে পায়ের চেটো দিয়ে পাস দিতে হয়।" ঢ্যাপঢ্যাপে বলটা কাদায় আটকে গেল। লোকটি ছুটে গিয়ে ড্রিবল করতে করতে বলটাকে আনল। ছেলেটি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। বৃষ্টির ফোঁটা থুতনী দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। চুল কপালে লেপটে। শার্টের ভিতর থেকে গায়ের শাদা চামড়া ফুটে উঠেছে।

"এইবার দেখো ডগা দিয়ে কি করে বল তুলতে হয়।" তুলতে গিয়ে পা পিছলে লোকটি পড়ে গেল। ছেলেটি কিন্তু হাসল না। বরং লোকটিই হেসে উঠল। এই সময় হঠাৎ বৃষ্টির বেগ বাড়তে আমরা প্র্যাকটিস বন্ধ করে ফিরে গেলাম। যাবার সময় দেখি লোকটি ছেলেটির চারপাশে বল নিয়ে ঘুরছে আর নাগাড়ে কথা বলে যাচ্ছে।

পরদিন পল্টু প্র্যাক্টিসে এল না। চোট পেয়ে ওর হাঁটু ফুলে উঠেছে। একাই হাজির হলাম মাঠে। নিমগাছতলায় লোকটি বসে। চেলাটি তখনো আসেনি। আমায় দেখে হেসে বলল "আর একজন কই ?"

কারণটা বললাম। তারপর কথায় কথায় ওর কাছে জানতে চাইলাম, কি করেন কোথায় থাকেন এবং ফুটবল খেলতেন কোন ক্লাবে। উত্তর দিতে ওর খুব আগ্রহ দেখলাম না। শুধু জানলাম মাইলদুয়েক দূরে ভট্চায পাড়ায় ভাইয়ের বাড়িতে থাকেন। অবিবাহিত। যুদ্ধে গেছলেন। ফিরে এসে কারখানায় ওয়েল্ডারের কাজ করেন। প্লুরুসি হওয়ায় কাজ ছেড়ে দেশের বাড়িতে গিয়ে যৎ-সামান্য জমিজমা নিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। এখন আর ভাল লাগছে না তাই ছোটভাইয়ের কাছে এসেছেন, কিন্তু এখানেও নানান অসুবিধা—অশান্তি। ভাবছেন, আবার দেশেই ফিরে যাবেন।

"হাঁ খেলতুম।" কাশতে সুরু করল। পিঠটা বেঁকে গেল কাশির ধমকে। বারকয়েক থুথু ফেলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। "বরাবর বুট পরেই খেলেছি। একবছর কালীঘাটেও ছিলুম, জোসেফ খেলত তখন। নাম শুনেছেন ওর ?"

আমি মাথা নাড়লাম। কি একটা বলতে যাচ্ছিল আবার কাশি শুরু হতেই থেমে গেল। গতকাল বৃষ্টিতে ভেজার মাশুল। এই দুর্বল শরীরে আজ যদি খেলা দেখাতে মাঠে নামে তাহলে নির্ঘাৎ মারা পড়বে, এই ভেবে ওকে বললাম, "আজ বোধহয় আপনার শিষ্যটি আসবে না। বরং আপনি বাড়িই ফিরে যান।"

"না, না, আসবে, ঠিক আসবে। বলেছি ওকে ফুটবলার তৈরী করে দেবই, তাতে যদি জীবন যায় তো যাবে। আমি যে পদ্ধতি নিয়েছি তার আর মার নেই। বুঝলেন, যে কোন বস্তুর উপরে যদি ইচ্ছার প্রভাব ছড়ান যায় তাহলে সফল হবেই।" দুবার কেশে নিয়ে আবার বলল, "বস্তুটি যদি কাঁচা হয়, তার মানে যদি অল্পবয়সী হয় তাহলে যে কাউকেই দুর্দান্ত প্লেয়ার করা যাবে। আমার এখন বয়স হয়ে গেছে, নয়তো নিজের উপরই পদ্ধতিটা পরখ করতাম।"

ছেলেটিকে ভাঙ্গা পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে আসতে দেখলাম। লোকটি তখন মাঠের অন্যধারে প্রায় পত্রহীন একটা শিমূল গাছের দিকে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা, গাছ তো তার পাতার মধ্য দিয়ে যা শুষে নেয় তাই দিয়েই খাদ্য তৈরী করে বেঁচে থাকে। তাই যদি হবে তাহলে ওই গাছটা কি করে বেঁচে রয়েছে?" ওর কণ্ঠস্বরে যেন ব্যক্তিগত সমস্যার দায় ধ্বনিত হল—"পাতাই নেই তাহলে বেঁচে আছে কি করে?"

হঠাৎ লোকটিকে আমার ভাল লাগতে শুরু করল এবং দুঃখও বোধ করলাম। যে পদ্ধতিতেই খেলা শেখাক এই গাব্দা চেহারার ছেলেটি যে কোনদিনই ফুটবলার হতে পারবে না, তাতে আমি নিঃসন্দিগ্ধ। ছেলেটাকে একবারও বলে লাথি মারতে না দিয়ে লোকটি নিজেই লাফালাফি করে যাচ্ছে। ছেলেটি সামান্য চনমনে হলে নিশ্চয় এভাবে কাঠের মত দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না। বস্তুত, এরকম হাঁদা ছেলে না পেলে লোকটি তাকে শিষ্যও বানাত না।

প্রায় আধঘণ্টা বসে থেকে লোকটির কর্মকাণ্ড দেখলাম। ছেলেটি চলে যেতেই আমার খাবারটা ওর দিকে এগিয়ে ধরে বললাম, "আমি তো আজ প্র্যাকটিস করলাম না, তাছাড়া খিদেও নেই।"

ভ্রু কুঁচকে বলল, "করুন না, আমি গোলে দাঁড়াচ্ছি।"

"না থাক, আজ মন লাগছে না।"

লোকটি আর কথা বাড়াল না। খাবারের প্যাকেটটা নিয়ে পকেটে রাখল। কোন কুণ্ঠা দেখলাম না। বিনয় দেখিয়ে ধন্যবাদও জানাল না। আমরা একসঙ্গেই মাঠ থেকে বেরোলাম, হাঁটতে হাঁটতে লোকটি একসময় বলল, "আমার কি মনে হয় জানেন, ফুটবলের তুল্য আর কোন খেলা পৃথিবীতে নেই। ক্রিকেট হকি ব্যাডমিণ্টন টেনিস যাই বলুন, সবই একটা ডাণ্ডা নিয়ে খেলতে হয়। ডাণ্ডা হাতে মানুষ! তার মানে প্রায় সেই বনমানুষের যুগের ব্যাপার। ফুটবল হচ্ছে সভ্যমানুষের খেলা, এর মধ্যে অনেক সায়েন্স আছে। সেটা রপ্ত করতে পারলে....ভাল কথা আপনার কি কোন বাতিল ছেঁড়া বুট আছে? কাল দেখলেন তো কেমন পিছলে পড়ে গেলুম। বুট হলে আরও ভাল ক'রে ডিমনস্ট্রেট করতে পারি।"

মাথা নেড়ে জানালাম, দেবার মত বুট আমার নেই। শুনে আফশোষে টাগরায় জিভ লাগিয়ে শব্দ করল। ওর গাল দুটি লক্ষ করলাম, আগের থেকে পাণ্ডুর এবং বসে গেছে। ঢলঢলে নীল পাজামাটায় গতদিনের কাদা শুকিয়ে আটকে রয়েছে। তালিমারা বলটা দুহাতে বুকে চেপে ধরে মাথা ঝুঁকিয়ে ওর হাঁটা প্রায় বাচ্চাছেলের মত দেখাচ্ছে। কিন্তু চোখ দুটিতে দারুণ উত্তেজনা! মনের মধ্যে হয়তো প্রতিপক্ষকে একের পর এক ড্রিবল করে এখন কাটিয়ে চলেছে। আমাকে কোনরকম বিদায় না জানিয়েই মোড়ে পৌঁছে আপন মনে সে নিজের বাড়ির পথ ধরল।

পরের সপ্তাহে ছেলেটিকে প্রথমবার বল নিয়ে নড়াচড়া করতে দেখলাম। দেখে মনে হল ওর থেকে এই আধবুড়ো লোকটি জোরে কিক্ করতে পারে, ছুটতে পারে, লাফাতে পারে। ছেলেটি কেন যে এত জিনিস থাকতে ফুটবল খেলা শিখতে এল ভেবে অবাক হলাম। আধঘণ্টা পরে, ছেলেটি চলে যাওয়ামাত্র বললাম, "কি রকম মনে হচ্ছে, হবে-টবে কিছু?"

"নিশ্চয়।" লোকটি প্রচণ্ড উৎসাহে বলল, "ঠিক করেছি এবার ওকে নামাব। যা কিছু শিখিয়েছি, সেগুলো খেলায় ব্যবহার করার মত উপযুক্ত হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। ওর স্কুলের একটা ট্রায়াল ম্যাচ আছে এই শনিবার, ও খেলবে। আমি টাচ লাইন থেকে দরকার মত বলে বলে দেব।"

"ওকে আগে কখনো কি খেলতে দেখেছেন?"

"না, তার দরকারই বা কী! এতদিন ধরে যা যা শিখিয়েছি সেটাই আমার দেখা দরকার। উন্নতি করেছে তাতে সন্দেহ নেই, নইলে ট্রায়াল ম্যাচে চান্স পাবে কেন!"

এবার আমি লোকটির জন্য হতাশা বোধ করলাম। নিজের কল্পনার জগৎকে আরোপ করার চেষ্টা করছে বাস্তব জগৎ-এর উপর। ফলাফল ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। মনশ্চক্ষে দেখলাম, কুঁজো হয়ে, পা ফাঁক করে লোকটি টাচ লাইন ধরে ছুটোছুটি করছে আর বিচ্ছু ছেলেরা ওর পিছনে ছুটছে, ভ্যাংচাচ্ছে, হাসছে, জামা ধরে টানছে। মাস্টার মশাইরা বলছেন, পাগলটাকে সরিয়ে দিতে। দেখতে পেলাম, অপমানে লজ্জায় ওর জ্বলজ্বলে চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে। মাঠ থেকে চলে যাচ্ছে মাথা নামিয়ে আর একপাল ছেলে ওর পিছু নিয়েছে।

"এখনই ওকে ম্যাচে নামানোটা কি একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছেনা?" যথাসম্ভব নম্রকণ্ঠে বললাম। "মাত্র ক'দিন তো শেখাচ্ছেন?"

"আমি হিসেব রেখেছি, মোট পঁচিশ ঘণ্টা ওকে কোচ করেছি। ছেলেদের ফুটবলে ভাল স্ট্যাণ্ডার্ডে রিচ করতে পঁচিশ ঘণ্টার কোচিংই যথেষ্ট।"

"কিন্তু এ ছেলেটাকে তো পাঁচশো ঘণ্টা কোচ করলেও কোন স্ট্যাণ্ডার্ডে পৌছতে পারবেনা"

প্রথমে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। তারপর হেসে

মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "ইচ্ছেটা যে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার আপনি বুঝবেন না। আপনি ইচ্ছে করুন সামাদ কি ছোনে কি গোষ্ঠ পালের মত খেলবেন....কিংবা আজকাল যাদের খুব নাম শুনি— পেলে, ইস্‌বুবিও....তাহলে ঠিক তৈরী হয়ে যাবেন।"

এই নিয়ে আর কথা বাড়ালাম না। ভাবলাম, যা খুশি করুক আমার তা নিয়ে মাথাব্যথার দরকার নেই। বরং শিক্ষা পেলে ওর জ্ঞানচক্ষু ফুটবে। লোকটি এরপর এক সপ্তাহ অনুপস্থিত রইল। রোজই পল্টুর সঙ্গে প্র্যাকটিসের সময় ভাঙ্গা পাঁচিলটার দিকে তাকাতাম। এই বুঝি আসে। পরে মনে হত, ছেলেটা নিশ্চয় ওকে ডুবিয়েছে তাই আমাদের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা পাচ্ছে বলেই আসছে না।

একদিন লোকটিকে আবার দেখলাম। নিমগাছতলায় দাঁড়িয়ে আমাদের প্র্যাকটিস দেখছে। পরনে লুঙ্গি আর হাওয়াই শার্ট মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ওকে দেখতে পেয়েছি বুঝতে পেরে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছিল, দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "সেদিনকার ট্রায়াল ম্যাচের খবর কী?"

লোকটি একবার থমকাল তারপর চলতে চলতেই বলল, "শুধু ইচ্ছাতেই হয় না, কিছুটা প্রতিভাও থাকা দরকার। আমারই ভুল হয়েছে।" এরপর ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে একবার তাকাল। আমি ওর চোখে গাঢ় প্রত্যাবর্তন কামনা দেখতে পেলাম। ওর চলে যাওয়া দেখে মনে হল, একটা আহত জন্তু গভীর অরণ্যের নির্জনে প্রাণ বিসর্জন দেবার জন্য যেন হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে।

কিছুদিন পর বাজার যাবার পথে ছেলেটিকে দেখতে পেলাম। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওর থেকেও কমবয়েসী ছেলেদের ডাংগুলি খেলা দেখছিল। লোকটির খবর জিজ্ঞাসা করতেই ও বিরক্ত স্বরে বলল, "কে জানে। বোধহয় আবার অসুখ-বিসুখ হয়েছে।"

"কোথায় থাকে জান ?"

"জানি, তবে আমি কিন্তু নিয়ে যেতে পারব না। আমায় দেখলেই এমনভাবে তাকায় যেন ভস্ম করে ফেলবে। আচ্ছা কি দোষ বলুন তো, মাঠে এমন কাণ্ড শুরু করল যে ছেলেরা ওর পেছনে লাগল। এজন্য কি আমি দায়ী ?"

"মোটেই না"

"তাহলে! আমি যদি খারাপ খেলি তাই বলে সকলের সামনে অমন হাউ হাউ করে কাঁদবে একটা বুড়ো লোক ?"

"তুমি বরং দূর থেকে বাড়িটা দেখিয়ে দাও। সেটা পারবে তো ?" অধৈর্য হয়ে বললাম।

"তা পারব।" ছেলেটি দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বলল।

কথামত দূর থেকে বাড়িটি দেখিয়ে দিয়েই ছেলেটি চলে গেল। জায়গাটা আধাবস্তি। তিনদিকে টালির চাল দেওয়া একতলা ঘর, মাঝখানে উঠোনের মত খোলা জায়গা। অনেকগুলো বাচ্চা হুটোপাটি চীৎকার করছে। তার পাশেই খোলা নর্দমা, থকথকে পাঁকে ভরা। একধারে লাউয়ের মাচা। চিটচিটে ছেঁড়া তোষক বাঁশে ঝুলছে। আস্তাকুঁড়ে একটা হাঁস ঠোঁট দিয়ে খুঁচিয়ে খাদ্য বার করছে। একজন স্ত্রীলোক এসে একটি বাচ্চার পিঠে কয়েকটি চড় মেরে তাকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল। আমার প্রশ্নে, ব্যাজার মুখে একটা ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে চলে গেল। একটু কৌতূহলও প্রকাশ করল না।

ঘরের দরজাটি পিছন দিকে। ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে তাকালাম। দেয়ালে অজস্র ক্যালেণ্ডার আর তোরঙ্গ, কৌটো, ঘড়া, বিছানা, মশারী প্রভৃতিতে বিশৃঙ্খল ঘরের কোণায় তক্তপোশে লোকটি দেয়ালে ঠেশ দিয়ে খাড়া হয়ে বসে। তাকিয়ে রয়েছে সামনের দেয়ালে। পাশ থেকে দেখতে পেলাম থুতনিটা এমনভঙ্গিতে তোলা যেন কিছুই ধর্তব্যের মধ্যে

আনছে না। গালের হাড় উঁচু হয়ে চোখ তুটিকে আরো ঢুকিয়ে দিয়েছে। মৃত্যু ওর শরীরে কোমল স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে এবং লোকটি আরামে আচ্ছন্ন হয়ে আছে মনে হল।

হঠাৎ ও ঘাড় ফেরাল। চোখাচোখি হল আমার সঙ্গে। মাত্র কয়েক হাত দূরেই দাঁড়িয়ে আছি কিন্তু ওর চোখে কোনরূপ ভাবান্তর প্রকাশ পেল না। রিক্ত কৌতূহলবর্জিত শূন্য চাহনী। মনে হল নিষ্পত্র প্রাচীন এক শিমূলের কাণ্ড, ক্ষয়প্রাপ্ত পাথরের মত যার বর্ণ, গতিহীন সঞ্চরণে প্রত্যাবর্তনরত। আমি পরিচিতের হাসি হাসলাম। ওর চোখে তা প্রতিফলিত হলনা।

গুণাদ্বয়

ভোররাতে সুমিত্রার গর্ভপাত ঘটল।

পান-বসন্তে ছ'দিন ধরে ভুগছে। জ্বর উঠল একশো তিন। নিখিল শুয়েছিল মেঝেয়। সুমিত্রার চিৎকারে ঘুম ভেঙে দেখল বিছানায় বসে চাপা আতঙ্কে ও তখন চেঁচাচ্ছে, "বেরিয়ে গেল, বেরিয়ে গেল।"

আলো জ্বেলে নিখিল দেখে সুমিত্রার দুই উরুর মাঝে কাপড়টা ফুলে রয়েছে। একটু নড়তেই দলমল করে উঠল সেই স্ফীতি। সুমিত্রা সাত মাসের পোয়াতি। ফ্যালফ্যাল করে নিখিলের দিকে তাকিয়েছিল। চোখ সরিয়ে নিল নিখিল। বসন্তের ক্ষতে মুখটা খোদলানো। পাশের ঘরে মা ঘুমোচ্ছে, তাকে ডেকে তুলল।

বাড়িওলার বৌ উপর থেকে নেমে এসে পরামর্শ দিল ডাক্তার ডাকতে। পাড়ার ডাক্তারকে ঘুম থেকে তুলে আনল নিখিল। তিনি সুমিত্রার নাড়ী কেটে পনেরোটি টাকা নিয়ে যাবার সময় বলে গেলেন ভয়ের কিছু নেই অর্থাৎ আর টাকা খরচ হবে না। বিছানার চাদর-তোষক রক্তে জবজব করছে। সুমিত্রার শায়ার রঙ বদলে গেছে, শাড়ির কিছু অংশে রক্ত। এ সব ফেলে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। ওকে কাপড় বদলিয়ে মা সেই চাদর শায়া ও শাড়ি ঘরের এক কোণে জড়ো করে রেখেছেন, সেই সঙ্গে সুমিত্রার পেট থেকে যে জিনিসটা বেরিয়েছে সেটাও।

বাড়িতে ধাঙড় আসতেই বাড়িওলার বৌ তাকে এই

জিনিসগুলো ফেলে দিতে বলল। দেখেই সে মাথা নাড়ল। এ কাজ তার দ্বারা হবেনা, পুলিসে ধরলে ফাটকে পুরে দেবে। দশ টাকা বখশিশ কবুল করেও তাকে রাজি করানো গেল না। তখন বাড়িওলার বৌ বাড়িওলার সঙ্গে পরামর্শ করে এসে বলল, "ডাক্তারের কাছ থেকে সার্টিফিকেট আনো। সেটা দেখালে পুলিস কিছু বলবেনা। উনি বললেন, এ তো আর আইবুড়ো বা রাঁড়ির পেট-খসানো মাল নয়। ভদ্দরঘরের বৌয়ের অ্যাসকিডেন্ট। তুমি বাপু ডাক্তারের কাছেই যাও।"

তাই শুনে নিখিল ডাক্তারের কাছে ছুটল। তখন ডাক্তার বাড়ি ছিলনা, কখন আসবে তারও ঠিক নেই। বাড়ি ফিরে সাত মাসের সন্তানটিকে বিছানার চাদর, শাড়ি ও শায়ার উপর রেখে নিখিল পরিপাটি করে ভাঁজ করল। শাড়ির পাড় ছিঁড়ে নিয়ে বেশ শক্ত করে বাঁধল যাতে জিনিসটার আকৃতি ছোট হয়। তার উপর খবরেরকাগজ মুড়ল। তাতে হুবহু মনে হতে লাগল একটা কাপড়ের প্যাকেট। কিছুদিন আগেই হ্যাণ্ডলুম হাউস থেকে পর্দার কাপড় ও ব্লাউজের ছিট কেনা হয়েছে। দোকানের নামলেখা ছাপা কাগজের থলিতে জিনিসটা এখনো রেখে দেওয়া আছে। তাইতে নিখিল প্যাকেটটা ভরে খাটের নীচে রেখে দিল। সুমিত্রা শুয়ে শুয়ে দেখছিল, কাতরস্বরে সে বলল, "শাড়িটা তো কাচিয়ে নিয়ে পরা যায়। একটুখানি জায়গায় তো মোটে লেগেছে।"

নিখিল একথা গ্রাহ্য করল না। সুমিত্রার দিকে তাকালোও না। ওর মুখে বসন্তের ঘা টস টস করছে। সাড়ে বারোটা নাগাদ আবার সে ডাক্তারের বাড়ি গেল। ডাক্তার খেতে বসেছে। সার্টিফিকেটটা পাঠিয়ে দিল ছেলের হাত দিয়ে। ছেলেটি হেসে বলল, "বাবা লিখেই রেখেছিল।"

বলার ধরনে মনে হল বলতে চায়, কি রকম বুদ্ধি দেখেছেন, বলার আগেই করে রেখেছে। কিন্তু পনেরো টাকা ফি দিয়েছি—এই

কথা নিখিল ভোলেনি। কৃতজ্ঞতা না জানিয়েই চলে এল। খুব ভোরে ঘুমভাঙা অভ্যাস নেই, তাই চোখ জ্বালা করছে। ভাত খেয়েই সে মেঝেয় সুমিত্রার খাটের পাশে শুয়ে পড়ল। মা পুরুত-মশায়ের বাড়ি গেছে সত্যনারায়ণের পূজোর ব্যবস্থা করতে। ক্যাজুয়াল লিভের হিসেব কষতে কষতে নিখিল ঘুমিয়ে পড়ল।

বিকেলে চা খেয়ে, নিখিল থলিটা হাতে ঝুলিয়ে বেরোল। বারবার পকেটে হাত দিয়ে দেখল ডাক্তারের সার্টিফিকেটটা আছে কি না।

গলি থেকে বড়ো রাস্তায় পা দিয়েই নিখিল ভাবল এবার কী করার? চারিদিকেই ঝকঝকে আলো, লোক, গাড়ি। থলিটা এখানেই কোথাও ফেলে রেখে গেলে কেমন হয়! এই ভেবে পায়ের কাছে সেটি রাখল।

অমনি কোথা থেকে একটা লোক এসে বলল, "পুজোর বাজার সেরে ফেললেন?" লোকটার লণ্ড্রি আছে পাড়াতেই। থলিটা হাতে তুলে নিয়ে নিখিল মাথা নেড়ে হাঁটা শুরু করল।

সুদৃশ্য থলিটা রাস্তায় ফেলে রেখে গেলে অনেকেরই চোখে পড়বে, তারমধ্যে পাড়ার লোকও থাকতে পারে। তারপর কেউ হয়তো খুলবে। বস্তুটি দেখেই হাউমাউ করে পুলিসে খবর দেবে। সেই চেনা লোকটি তখন আগ বাড়িয়ে বলবে, হ্যাঁ হ্যাঁ, জানি লোকটাকে আমাদের পাড়াতেই ছাব্বিশের-দুইয়ে থাকে, নাম নিখিল চাটুজ্যে, ব্যাঙ্কে কাজ করে। তখন পুলিসটা হাতে কাগজের থলিটা ঝুলিয়ে এবং তার পিছনে একপাল লোক মজা দেখা এবং কেচ্ছা রটাবার জন্য বাড়িতে এসে হাজির হবে।

দৃশ্যটা কল্পনা করতে গিয়ে নিখিলের দম বন্ধ হবার উপক্রম। সামনেই চিলড্রেন্স পার্ক, তারই একটা বেঞ্চে, কোলে থলিটা রেখে সে বসল। কিছুক্ষণ সে চারপাশে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল চেনা এমন মানুষ কেউ আছে কিনা। কাউকেই সে চিনল না। তবে ত কে

চেনে এমন অনেকেই হয়তো থাকতে পারে। চিনেবাদামওলা ডেকে এক আনার কিনল। বাদাম খেতে খেতে ভাঁজতে শুরু করল, কী ভাবে থলিটার হাত থেকে বিনা ঝামেলায় রেহাই পাওয়া যায়।

একটু পরেই সন্ধ্যা হবে। আধমাইলটাক দূরে নির্জন গলি বা মাঠ দেখে থলিটা টুক করে নামিয়ে রেখে দিলেই ল্যাঠা চুকে যাবে। এই ভেবে নিখিল ভারি সুখবোধ করল। চিনেবাদামওলাকে আবার ডেকে এক আনার কিনল এবং ঝগড়া করে দুটো বাদামও আদায় করল।

একা চুপচাপ বসে থাকা যায় না, বিশেষত তার সামনের দৃশ্য— বাচ্ছাদের ছুটোছুটি, কিশোরীদের পায়চারীতে নকল গাম্ভীর্য, অফিস ফেরত বাসের জানলায় সারিবাঁধা বিবর্ণ মুখ, বারান্দায় কনুই রাখা নতদেহ নিঃসঙ্গ যুবতী, রিক্সাচালকের ঘামেভেজা ঘাড়—যদি খুবই একঘেঁয়ে হয়। নিখিল ভাবল লণ্ড্রিওলাটাকে। এমন কোনো বার যায়নি প্যাণ্টের একটা-না-একটা বোতাম ভেঙেছে। শেষবার ঝগড়া করতে হয়েছে শার্টে নম্বরী মার্কা দেওয়ার ব্যাপারে। লোকের চোখে পড়ে কালিটা। এই সময়ে হঠাৎ নিখিলের মনে পড়ল, খুব ছেলেবয়সে একটা ডিটেকটিভ বইয়ে সে পড়েছিল ধোপা বাড়িতে কাচা কাপড়ের নম্বরী মার্কা ধরে তদন্ত করতে করতে গোয়েন্দা শেষকালে খুনীকে ধরে ফেলে। এই থলির মধ্যে সুমিত্রার কাপড় এবং বিছানার চাদরে নিশ্চয়ই লণ্ড্রিওলাটা নম্বর দিয়েছে। সুতরাং যেখানেই ফেলা যাক না কেন, পুলিস ঠিক তাকে বার করে ফেলবেই।

এইবার ঘামতে শুরু করল নিখিল। যদি বছর খানেকেরও বাচ্চা হত, তাহলে সকলের চোখের সামনে দিয়ে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে চিতা সাজিয়ে পোড়ান যেত। কিন্তু একতাল মাংসপিণ্ডকে তা করা সম্ভব নয়। আর হতে পারে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসা। কিন্তু কেউ যদি দেখে ফেলে! হৈ-চৈ করে ভীড় জমাবে। কত কথা

জিজ্ঞাসাবাদ করবে। শেষে পুলিসে দেবে। কী ফেললুম সেটা প্রমাণ করা সহজ কথা নয়। সার্টিফিকেটটা দেখালেও বিশ্বাস করবে কেন? ঠিক ওই জিনিসটাই ফেলেছি কি অন্য কাউকে খুন করে কুচিকুচি করে প্যাকেটে বেঁধে ফেলিনি তার প্রমাণ কি!

নিখিলের মাথা ঝিমঝিম করতে শুরু করল। আর হতে পারে এই থলিটার রঙচঙ দেখে যদি কেউ এটাকে চুরি করে। চোর নিশ্চয় পুলিসকে খবর দেবে না। নিখিল এধার-ওধার তাকিয়ে চোর খুঁজতে শুরু করল, এবং আশ্চর্য হল একটা লোককেও তার চোর-চোর মনে হচ্ছে না। অথচ প্রতিদিনই যত লোক দেখে তারমধ্যে প্রায় ডজন-খানেককে তার চোর বলে মনে হয়। এমনকি ঘর থেকে ঘড়িটা চুরি যাওয়ায় ঝি-কে সবাই সন্দেহ করলেও তার প্রথমেই মনে পড়েছিল বাড়িওলার মুখ। কিন্তু এখন একটাও চোর সে দেখতে পাচ্ছে না।

চোর নিশ্চয়ই কলকাতায় আছে, হয়তো এখন এই জায়গাটায় একজনও নেই। নিখিল থলি হাতে উঠে পড়ল। থলিটা হাতে ঘুরে বেড়ালে নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনো ছিন্‌তাইওলাকে আকর্ষণ করবে। তবে অন্ধকার রাস্তায় ছাড়া তাদের পাওয়া যাবে না। নিখিল আবার বসে পড়ল সন্ধ্যাটা পুরোপুরি নামার অপেক্ষায়।

যখন জাঁকিয়ে সন্ধ্যা নামল নিখিল হাঁটতে শুরু করল উদ্দেশ্য-হীনভাবে। বহু ডাস্টবিন সে পেল যেখানে থলিটা ফেলে দেওয়া যায়। কিন্তু একটা ভয় ওর মনে গেঁথে আছে, বলা যায় না কে কোথা থেকে দেখে ফেলবে—হয়তো অন্ধকার গলিতে কোনো যুবক পাড়ার মেয়েকে চুমু খেতে খেতে কিংবা কোনো বুড়ি অন্ধকার বারান্দায় জপ করতে করতে বা রান্নাঘর থেকে কোনো গৃহিণী। একবার চেঁচিয়ে উঠলেই হল! তাও যদি না হয়, কাপড়ের নম্বরী মার্কা যাবে কোথায়? পুলিসের গোয়েন্দা তদন্ত করে ঠিক বার করে ফেলবে। তখন অবশ্য সার্টিফিকেট দেখিয়ে বলা যাবে, মশাই

অবৈধ কোনো ব্যাপার নয়। বাড়িওলাকে চোরের মতো দেখতে হলেও বলেছে অ্যাকসিডেণ্ট। স্বেচ্ছাকৃত ঘটনা নয়। যে কোনো পরিবারেই এমন ঘটতে পারে। কিন্তু এসব বলার আগেই, পুলিস দেখে পাড়ায় ফিসফাস শুরু হবে। গুজব রটবে। মাস কয়েক আগেই তো একটা সার্জেণ্ট এসেছিল পাড়ায়, অমনি শোনা গেল, দেবব্রতবাবু বাড়িতে জুয়া খেলত তাই ধরে নিয়ে গেল। শেষে জানা যায়, ভদ্রলোকের একটা রিক্‌সা আছে, সেটা অ্যাকসিডেণ্ট করায় থানায় ডাক পড়েছে।

হাঁটতে হাঁটতে নিখিল ক্লান্ত হয়ে পড়ল। থলিটা ছিনিয়ে নিতে কেউ তার সামনে ছোরা বার করলনা। অথচ বস্তি দেখলেই সে ঢুকেছে। কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায় নি। প্রায়-নির্জন গলি দিয়েও হাঁটল। একটা ঝি শ্রেণীর মেয়েমানুষ শুধু তেরছা চোখে তাকে দেখল মাত্র। এছাড়া কিছুই না হওয়ায় নিখিল ভাবতে বাধ্য হল, তাহলে ?

এইবার সে ভয় পেতে শুরু করল। তাহলে এই সাত মাসের মৃত সন্তানটিকে নিয়ে সে এখন করবে কি ? পনেরো-ষোলো ঘণ্টা হয়ে গেল। এবার পচ ধরবে, গন্ধ বেরোবে। অন্তত সুমিত্রার পেটে পুরো সময়টা কাটিয়েও যদি বেরোত! দোষটা অবশ্য কারুরই নয়। অথচ এইরকম একটা নির্দোষ ব্যাপার তাকে বিপাকে ফেলল। নিখিলের খুব রাগও হল। সেই সঙ্গে এটাও টের পেতে লাগল—আসলে সে ভয়ানক ভীতু। রীতিমত কাপুরুষ। এরকম ঘটনা নিশ্চয় কলকাতায় এই প্রথম ঘটছেনা। সেসব ক্ষেত্রে কিছু একটা অবশ্যই করা হয়েছে। কিন্তু নিখিল ভাবল, তারা তো আমার মতো নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রকৃতিগত হুবহু মিল থাকতে পারে না। তারা নিশ্চয়ই সাহসী ছিল অন্তত আমার থেকে।

হঠাৎ নিখিলের মনে হল, তার থেকেও ভীতু এমন কারুর

ঘাড়ে যদি দায়িত্বটা চাপিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে রেহাই মিলবে। ভীতুরা পুলিসে যাবে না। থলিটা নিয়ে এইভাবেই ঘুরে বেড়াবে আর ভাববে কি করে রেহাই পাওয়া যায়। অবশ্য গোপনেই তার ঘাড়ে চাপাতে হবে, নয়তো জিনিসটা কার জানতে পারলে বাড়ি বয়ে ফেরত দিয়ে আসবে।

চেনাশুনো ভীতু কে আছে, নিখিল তাই ভাববার জন্য একটা ট্রাম-স্টপে দাঁড়িয়ে পড়ল। বহুজনের নাম তার মনে এলো। তারা কি পরিমাণ ভীতু তার নানান উদাহরণ মনে করতে লাগল। অবশেষে শশাঙ্ককেই তার পছন্দ হল। প্রায় চারবছর সুমিত্রার গৃহশিক্ষক ছিল। সুমিত্রাদের তরফ থেকেই বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু শশাঙ্ক নানান অজুহাত দেখিয়ে বিয়েতে রাজি হয়নি। নিখিলের সঙ্গে সুমিত্রার আলাপ ওই করিয়ে দেয়। অবশ্য মাস-ছয়েক হল ও বিয়ে করেছে। এখন যদি শশাঙ্কর সামনে হাজির হওয়া যায়, তাহলে নিশ্চয় ওর মনের মধ্যে সুমিত্রা, প্রেম, বিবাহ-প্রস্তাব অগ্রাহ্য অর্থাৎ যাবতীয় ধাষ্টামো এবং অন্য আর-একজনকে বিবাহ সব মিলিয়ে অপরাধবোধ তৈরি করবে। প্রাক্তন প্রেমিকদের তুল্য ভীতু আর কে? এই থলিটা ওর হাতে কোনো রকমে গছাতে পারলে, তারপর শশাঙ্করই ঝামেলা। বস্তুত সুমিত্রার প্রতি ওর বিশ্বাসঘাতকতার এটা ভাল একটা শাস্তিও হবে।

নিখিল এতসব ভেবে প্রফুল্লবোধ করল। তবে পুরোপুরি অস্বস্তি ঘুচল না। শশাঙ্ক থাকে একটা গলির একতলায়। কড়া নাড়তে ঝি দরজা খুলল। শশাঙ্ক বেরিয়ে এলো, পরনে লুঙ্গি এবং গেঞ্জি। নিখিলকে চিনতে পেরে উচ্চকণ্ঠে সাড়ম্বর অভ্যর্থনা জানিয়ে ঘরে নিয়ে গেল।

"সন্ধ্যা ছাখো ছাখো কে এসেছে।" এই বলে শশাঙ্ক ডাকতেই ভিতর থেকে ওর বৌ এল। দেখতে মোটামুটি। রেডিওয় গান গায়, দু-একটা রেকর্ডও আছে। নিখিল দাঁড়িয়ে উঠে নমস্কার করল।

"আপনার কথা ওর কাছে শুনেছি।" সন্ধ্যার এই কথায় নিখিল বিস্মিত হল। সুমিত্রার স্বামীর প্রসঙ্গ বৌয়ের কাছে ভীতু শশাঙ্ক কি তুলবে? না কি এটা আলাপ করার একটা কেতা!

"আমার সব বন্ধুর গল্পই করেছি সন্ধ্যার কাছে, সুতরাং পরিচয় করিয়ে গুণপনা ব্যাখ্যার দরকার আর হবে না।"

শশাঙ্ক একটা বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে পা নাচাতে লাগল। ঘরের সব আসবাবপত্রই যে ওদের বিয়ের পর কেনা তা রঙের ঔজ্জ্বল্যতেই বোঝা যায়।

"ওনার গুণপনার খবর অবশ্য না বললেও আমরা জানি।" নিখিল ইচ্ছে করেই 'আমরা' বলল। সন্ধ্যাও যথারীতি বিনয় জানাতে 'ভারি তো গুণপনা, আমার মতো গাইয়ে গণ্ডাগণ্ডা আছে' ইত্যাদি কথা পরম সুখে বলে গেল। এরই মধ্যে নিখিল শশাঙ্কর হাবভাব জরীপ করে একটা প্ল্যান তৈরিতে হাত দিল।

"আমি তো এলাম, এবার আপনারাও একদিন চলুন।"

"নিশ্চয়।" শশাঙ্ক যেন প্রস্তাবটার জন্য ওৎ পেতেই ছিল। "কবে যাবো বলো, সামনের রোববার? তাহলে, ইলিশ খাওয়াতে হবে। তেলাপিয়া খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেল, সুমিত্রা দারুণ ইলিশ-ভাতে করতে পারে?"

নিখিলকে হাসতেই হল। সন্ধ্যা কপট উদ্বিগ্নতা দেখিয়া বলল, "এখন ইলিশ পাওয়া যায় না আর তুমি ভদ্রলোককে বিব্রত করতে বায়না ধরলে ইলিশ খাব।"

"আরে ও আবার ভদ্রলোক কি, ওতো নিখিল। ওকে সব থেকে লেগপুল করতাম আমি আর সনৎ। সনৎ লিখেছে ছুটি পেলে জানুয়ারিতে কলকাতা আসবে। তোর ঠিকানাটা লিখে দিস ওকে পাঠাব।" শশাঙ্ক সবিস্তারে সনৎ-এর গল্প করে চলল আর নিখিল ভাবল, একি!

"পূজোর বাজার নাকি?" হঠাৎ সন্ধ্যা প্রশ্ন করল। নিখিল

লাজুক হেসে ঘাড় নাড়ল। শশাঙ্ক ছোঁ মেরে থলিটা হাতে তুলে নিয়ে বলল, "দেখি বৌয়ের জন্য কি শাড়ি কিনলি।" নিখিল তাড়াতাড়ি ওর হাতটা চেপে ধরল। "আরে ধ্যেৎ, দেখার কি আছে আর। মার থান, ঝিয়ের কমদামী একটা মিলের আর সুমিত্রার একটা তাঁতের ষোলো টাকার শাড়ি। খুলিসনি প্লিজ। বেশ বাঁধাছাদা রয়েছে আবার কেন খাটুনি বাড়াবি।"

"সন্ধ্যা দেখেছ, বৌয়ের শাড়ি আছে কিনা, অন্যের হাতের ছোঁয়াতেও আপত্তি। কি রঙের কিনেছিস? শ্লেট না ডীপ মেরুন? একটা রঙ সুমিত্রা একবার পরেছিল মেরুনের ওপর গ্রীন ফুটি-ফুটি, পাড়টা হোয়াইট, দারুণ দেখাচ্ছিল ওকে।"

"রঙ খুব ফর্সা বুঝি?" সন্ধ্যাকে খুব কৌতূহলী দেখাল।

"না, খুব নয় আপনার মতোই।"

"ওমা, তাহলে তো বেশ কালো।"

"আপনি কালো হলে আমরা তো আলকাতরা।"

নিখিল হাস্যমুখে শশাঙ্কের দিকে তাকিয়ে সমর্থন চাইল। শশাঙ্ক বড়ো করে ঘাড় নাড়ল। রঙের প্রশংসায় পুলকিত সন্ধ্যা বলল, "দেখেছেন চা দিতেই ভুলে গেছি।"

সন্ধ্যা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই নিখিল বলল, "শশাঙ্ক, একটা খুব অসুবিধায় পড়ে গেছি।" জিজ্ঞাসু নেত্রে শশাঙ্ক তাকিয়ে রইল। তখন নিখিল আদ্যোপান্ত ব্যাপারটা বলে টেবলের ওপর রাখা কাগজের থলিটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, "ওর মধ্যেই সেটা রয়েছে।"

শশাঙ্ক চড়াং করে সিধে হয়ে বসল। "তার মানে, তুমি ওই কুৎসিত জিনিসটা আমার টেবিলের উপর রেখেছ? নামাও নামাও বলছি।" দাঁত চেপে হিস্‌হিস্ করে শশাঙ্ক আঙুল দিয়ে মেঝে দেখাল। নিখিল নামিয়ে রাখল।

"কি করতে এখানে এনেছ?" চাপাস্বরেই শশাঙ্ক বলল, ভিতরের দিকে চোখ রেখে।

"এটাকে নিয়ে কি করব ভেবে পাচ্ছি না।"

"ফেলে দেবে, আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।"

"বলাটা তো খুবই সোজা, ফেলতে গেলেই লোকে দেখে ফেলবে। তখন চিৎকার হবে, একগাদা লোক জমবে, টানতে টানতে হাজার হাজার লোকের মধ্য দিয়ে থানায় নিয়ে যাবে। অশ্লীল কথা বলাবলি করবে।"

"তা আমায় কি করতে হবে?"

"এটার একটা বন্দোবস্ত করে দে, শশাঙ্ক প্লিজ। তোর কথাতেই বিয়ে করেছিলুম। এবার তুই আমার কথা রাখ।" নিখিল হাত বাড়াল শশাঙ্কর হাত চেপে ধরার জন্য। হাতদুটো তার আগেই শশাঙ্ক তুলে নিয়েছে। টেবলে নিখিলের দুটোহাত থলিটার পাশে পড়ে রইল।

"আমার কথাতেই কি শুধু বিয়ে করেছিলি? সুমিত্রাকে তোর পছন্দ হয়নি?"

"নিশ্চয়, ওকে নিশ্চয় ভালবেসেছিলুম, আজও বাসি। কিন্তু তোর সঙ্গে ওর একটা সম্পর্ক ছিল তাও জানি।"

"তাই এক্‌সচেঞ্জ করতে এসেছিস্‌, এই জিনিসটার বদলে।" শশাঙ্ক থলিটার দিকে আঙুল তুলেছে তখন চায়ের কাপ হাতে সন্ধ্যা ঢুকল।

"কিসের এক্‌স্‌চেঞ্জ?" হাসিমুখ করে সন্ধ্যা একটা চেয়ারে বসল।

"নিখিল বলছিল তুমি যদি গোটাকতক গান শোনাও। তাইতে বললুম বৌয়ের শাড়িটা তার বদলে দিতে হবে।"

"আহা, পছন্দ করে উনি কিনেছেন। আর গান যা গাই সে এমন কিছু নয়।"

সন্ধ্যা মেয়েটি ভাল। এরপর খুব বেশি সাধাসাধি করতে হয়নি। খালি গলায় তিনটি গান করল। শশাঙ্ক উঠে দাঁড়িয়ে

বলল, "নিখিলকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি। পাঞ্জাবিটা দাও।"

ওরা দুজন চুপচাপ পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। রাত হয়েছে। রাস্তায় লোকজন কম। দোকানগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার আলোর পরিমাণ খুবই অল্প। নিখিলের মনে হল, রাস্তার যে-কোন জায়গায় থলিটা রেখে নির্বিবাদে চলে যাওয়া যায়।

"ওটা দে।" শশাঙ্ক দাঁড়িয়ে পড়ল।

"কেন!"

"ওই ডাস্টবিনটায় ফেলে দি।"

"সে তো আমিও পারতুম, তাহলে তোর কাছে এলুম কেন?"

"তবে কি মতলব তোর?' হঠাৎ শশাঙ্ক গলার স্বর ও দাঁড়াবার ভঙ্গি পালটে ফেলল। নিখিল পা-পা করে পিছোল। দূরে পানের দোকানটা মাত্র খোলা। এখন থলি হাতে ছুটতে শুরু করলে চোর বলে ধরা পড়তেই হবে। নিখিল দাঁড়িয়ে রইল।

"তুমি এখন সুমিত্রার বিয়ে করা স্বামী।" শশাঙ্ক ওর বুকের জামা মুঠো করে ধরল, "তুমি এই জিনিসটার বৈধ অভিভাবক, তার সার্টিফিকেটও পকেটে আছে। অতএব এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব তোমার। আমার দায়িত্ব বহুদিন আগে শেষ হয়েছে। তবুও আমার কাছে কেন এসেছ?" নিখিলকে ঝাঁকাতে শুরু করল শশাঙ্ক।

"তুই আমার ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছিস। তুই কাওয়ার্ড, তুই ইর্‌রেস্‌পন্‌সিব্‌ল।" নিখিল মরীয়া হয়ে উঠল শূন্য প্রায়ান্ধকার রাজপথে। শশাঙ্কর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য ধাক্কা দিল। বদলে জোরে চড় মারল শশাঙ্ক। এইবার ক্রোধে দিশেহারা হয়ে মারবার জন্য নিখিল ঝাঁপিয়ে পড়ল।

হঠাৎ জানালা খুলে দোতলা থেকে এক পুরুষকণ্ঠ গর্জে উঠল, "কি হচ্ছে, অ্যাঁ, গুণ্ডামি?" লোকটা চিৎকার করে উঠল! দুড়দাড় করে কিছু লোকের ছুটে আসার শব্দ এল অন্ধকারের মধ্য থেকে।

নিখিল আর চিন্তা করার সুযোগ নিজেকে দিলনা। প্রাণপণে রাস্তার নির্জন দিকে ছুটতে শুরু করল। ছুটতে ছুটতে যখন দম ফুরিয়ে এল, থামল। তখন পায়চারী করতে করতে এক কনস্টেবল তার কাছে এসে, কেন সে এমন করে হাঁপাচ্ছে তার কারণ জানতে চাইল। নিখিল বলল, একটা গুণ্ডা তাকে তাড়া করেছিল। কনস্টেবল জানতে চাইল গুণ্ডাটা কোনদিকে? নিখিল আঙুল দিয়ে দেখাল। কনস্টেবলটি কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে থেকে "আচ্ছা ঠিক হ্যায়" বলে পায়চারী করতে করতে চলে গেল।

নিখিল এইবার টের পেল কাগজের থলিটা তার কাছে নেই। ছোটার সময়ও হাতে ছিলনা। সেটি শশাঙ্কর কাছেই রয়ে গেছে। শশাঙ্ককে লোকগুলো জিজ্ঞাসা করলে ও নিশ্চয় বলবে গুণ্ডা তাড়া করেছিল। গুণ্ডা নিশ্চয়ই সুদৃশ্য কাগজের থলিতে ভরা কাপড়ের প্যাকেট ফেলে যায়নি। লোকগুলো খুব খুশি হয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করবে, ভাগ্যিস আমরা এসে পড়লুম তাই ভদ্রলোকের এই জিনিসটা রক্ষে পেল। এই বলে তারা থলিটা শশাঙ্কর হাতে তুলে দেবে।

নিখিল বুকপকেটে হাত দিয়ে সার্টিফিকেটটা অনুভব করে ভারি আরাম পেল। এবং সে মনশ্চক্ষে দেখল, শশাঙ্ক সেই থলিটা হাতে নিয়ে হেঁটে চলেছে।

যুক্তফ্রন্ট

তখন ভরদুপুর। খুকি দুহাতে জানলার গরাদ ধরে, শরীরকে আল্‌গা করে দাঁড়িয়ে। গলিটা খুব সরু। এঁকেবেঁকে একদিকে বড় রাস্তায় অন্যদিকে একটা বস্তির মধ্যে পড়েছে। জানলার সামনেই একটা কারখানাবাড়ির টিনের দেয়াল। বস্তুত জানলায় দাঁড়িয়ে খুকি কিছুই দেখতে পায়না যদিনা কোনো লোক জানলার সামনে দিয়ে যায়। বস্তির লোকই বেশির ভাগ সময় যাতায়াত করে। তাদের দেখতে খুকির ভাল লাগেনা। খুকির স্বাস্থ্য ভাল। দেখতেও মন্দ নয়। পাত্র দেখা হচ্ছে।

মেঝেয় আদুড় গায়ে ওর মা ঘুমোচ্ছে, পাশের ঘরে বৌদি বাচ্চা নিয়ে। দুই ছোট ভাই স্কুলে গেছে। বাবা আর দাদা অফিসে। আশেপাশে সমবয়সী মেয়ে নেই যে খুকি দু-দণ্ড ঘুরে আসবে। সামনের টিনের দেয়ালে একটা পোস্টারে লেখা—সাম্রাজ্যবাদকে খতম করতে হলে শোধনবাদের সঙ্গে লড়াই করুন। খুকি দেখল গত পনের দিনে 'খতম করতে'টা বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে। 'করুন'টা ছেঁড়া। এ-ছাড়া গলিতে কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ছে না। একটা সিনেমা পোস্টারও ঢোকেনা এমন হতভাগা গলি।

বড় রাস্তার দিকে পটকা ফাটার শব্দ হল দুটো। কিছু হৈচৈও শোনা গেল। ও রকম হরদমই শোনা যায়। খুকির তখন কারখানাবাড়ির চালায় চোখ। দুটো পায়রা, নিশ্চয়ই মদ্দা এবং মাদী, বকম-বকম করতে করতে যা করার তাই শুরু করে

দিয়েছে। খুকি প্রথমেই পিছনে তাকিয়ে ঘুমন্ত মাকে দেখে নিল। অতঃপর নিশ্চিন্ত হয়ে, গভীর মনোযোগে যখন মুখটি উপরে তুলে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল তখন সে শুনতে পেলনা গলি দিয়ে ছুটে আসা পায়ের শব্দ।

তাই বিষম চমকে গেল লোকটিকে একেবারে তার ত্রু-হাতের মধ্যে দেখে। হাতে ক্যাম্বিসের ব্যাগ। ব্যাগটা জানলা গলিয়ে খুকির পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে, "এটা রাখুন তো পরে নিয়ে যাব।" বলেই ছুটে চলে গেল।

খুকির তখন রা কাড়ার ক্ষমতা নেই। নড়াচড়ারও। ফ্যালফ্যাল করে সে ব্যাগটার দিকে শুধু তাকিয়ে। অনেকগুলো পায়ের শব্দ আর "ডাকাত ডাকাত, পাকড়ো পাকড়ো" চিৎকার গলি দিয়ে এগিয়ে আসছে। ভয় পেয়ে খুকি জানলা বন্ধ করে দিল। শুনতে পেল ছুটন্ত লোকগুলো বলছে, "ব্যাঙ্কের সামনেই—গাড়িতে ওঠার সময় লুট করেছে। একটা ধরা পড়েছে।" অবশেষে পায়রাদের কাণ্ড, এবং এই ব্যাগ, তুয়ের ধাক্কা সামলাতে না পেরে খুকি মাকে ডেকে তুলল।

মাঝরাতে বাবা মা দাদা বৌদি ঘরের দরজা জানলা এঁটে গুনে দেখল দশটি বাণ্ডিলে মোট দশহাজার টাকা। সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

"ঠিক কি বলেছিল লোকটা, আবার আসব?" দাদা ফিসফিস করে বলল।

"ওকে দেখলে আবার চিনতে পারবে কি? মনে তো হয় না।" ফিসফিস করে মা বলল।

"তাতে কি আসে যায়, বাড়িটা তো চিনবে।" বৌদি চাপা সুরে বলল।

"লোকটা ধরা পড়েছে কিনা আগে সেই খোঁজ নিতে হবে।" বাবা দমবন্ধ করে বলল।

"ব্যাগটা এখন কোথায় রাখা হবে?"

"আমার খাটের তলায় থাক।" বৌদি পরামর্শ দিল।

"ইঁদুর আরশুলার উৎপাত বড়। কেটে দেবে। বরং ঠাকুরঘরে থাক।" মা প্রতিবাদ করল।

রাখা সম্পর্কে কোনো ঐকমত্য না হওয়ায় স্থির হল ভাঁড়ারে আটা রাখার ড্রামে ব্যাগটা ভরে ঢাকনাটা কষে এঁটে দেওয়া হোক। যদি পুলিশ সার্চ করতে আসে আগেই তো সিন্দুক তোরঙ্গ দেখবে। আটার ড্রাম অনেক নিরাপদ।

পরদিন সকালেই দাদা এবং বাবা খবরের কাগজে হুমড়ি খেয়ে বৃত্তান্তটা খুঁজে খুঁজে পেয়ে গেল। মাইনে দেবার জন্য দশহাজার টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে এক কারখানার ক্যাশিয়ার গাড়িতে উঠছিল। তখন দুজন দুর্বৃত্ত বোমা ছুঁড়ে টাকারথলি ছিনিয়ে চম্পট দেয়। একজন ধরা পড়েছে, থলি নিয়ে অন্যজন পালিয়ে গেছে। ক্যাশিয়ার হাসপাতালের পথেই মারা যায়।

তখন ফিসফিস করে দু-জনে বলাবলি করল।

"আর কেউ জানে বলেতো মনে হচ্ছেনা।"

"কি করে জানবে? ছুটতে ছুটতে গলিতে ঢুকে বোধহয় ভয় পেয়েই থলিটা তাড়াতাড়ি নামিয়ে দিয়ে গেছে। আনাড়ি মনে হচ্ছে।"

"নিশ্চয় নিতে আসবে।"

"আসুক না, দেখা যাবেখন।"

"যদি ধরা পড়ে তাহলে ভালই হয়।"

"মারের চোটে কোথায় থলিটা রয়েছে পুলিশের কাছে তা ফাঁস করেওতো দিতে পারে?"

"তা বটে। ধরা না পড়াই ভাল।"

"অবশ্য বলা যায়, থলির কথা আমরা কিছুই জানিনা।"

"তাহলেও পুলিশ সার্চ করতে আসবেই। গুণ্ডাটাকে যখন

ভদ্দরলোকের মতই দেখতে, অবশ্য খুকির মতে, তখন পুলিশ কোনো ওজর আপত্তিই শুনবেনা। বহু ভদ্রলোকই তো এসব কাজ করে।"

"তাহলে থলিটা বাড়িতে রাখা ঠিক হবেনা। আমার শালার কাছে বরং—"

"না না, এখন কোনো জিনিস হাতে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরনো ঠিক নয়। পুলিশ নিশ্চয় নজর রাখছে। তাছাড়া এই গুণ্ডাটা আগে ধরা পড়ুক তবে তো?"

"গুণ্ডাটা নিশ্চয় একা নয়, দলও আছে। যদি চড়াও হয়?"

দুজন ভীষণ ভাবনায় কথা বন্ধ করে ফেলল। তারপর চান-খাওয়া সেরে যে যার অফিসে চলে গেল। দুপুরে খুকির মা আর বৌদি রান্নাঘরে খেতে খেতে বলাবলি করল: "দরজা-জানলাগুলো ভাল করে বন্ধ আছে কিনা শোবার আগে আবার দেখতে হবে।"

"কড়া নাড়লেই যেন দরজা খুলোনা। আগে দেখে নিয়ে তারপর।"

"তার থেকে যদি দাদার ওখানে রাখা যেত তাহলে এত ভয়ের কিছু থাকত না।"

"দরকার কি আবার লোক জানাজানি করে।"

"দাদা সেরকম লোকই নয়। তাহলে আর ব্যবসা করে খেতে হোতনা। আমার বিয়েতে চারহাজার টাকা ধার করেছিল কক্ষনো কারুর কাছে তা ভাঙেনি, এমন চাপা।"

"তোমার দাদা ছেলে ভাল। খুব নম্র, ভদ্র।"

"ওই জন্যই তো দাদা খালি লোকসান দিচ্ছে। কতবার ওর বন্ধুরা, এমন কি খদ্দেররা পর্যন্ত বলেছে অত সৎ হলে ব্যবসা করা চলেনা। একদম মিথ্যা বলতে পারেনা। অথচ কি ভাল ব্যবসা! কত মাড়োয়ারী টাকা নিয়ে সাধাসাধি করেছে পার্টনার হবার জন্যে। যদি নেয় তাহলে এখনো হেসেখেলে মাসে পাঁচ হাজার লাভ করতে পারে। কিন্তু অই!"

"তা নিলেই তো পারে।"

"বাঙালি ছাড়া নেবেনা, এমন গোঁয়ার যে কি বলব! আপনার ছেলেকে তো বললুম দাদার সঙ্গে নেমে পড়। চাকরির সাড়ে চারশো টাকায় ছেলেপুলে নিয়ে কি বাঁচা যায়? হাজার সাত-আট দিলেই—"

"অত চেঁচাচ্ছ কেন। এখন চারদিকে লোক ঘুরে বেড়াবে। একবার একটুখানি শুনতে পেলেই এসে পড়বে। খুকি কোথায়? কি করছে?"

খুকি তখন ছাদে। পাঁচিলে কনুই রেখে গালে হাত দিয়ে এমনিই দাঁড়িয়ে। একতলা বাড়ির ছাদ তিনদিক থেকে চাপা। একটুখানি মাত্র গলির দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। মায়ের ডাকে খুকি নিচে নেমে এসে জানলাবন্ধ অন্ধকার ঘরের মেঝেয় শুয়ে পড়ল।

রাতে খুকির বাবা-মা চাপা গলায় আলোচনা করার জন্য বহুদিন পরে আজ পাশাপাশি শুল। দুই ছেলে এবং খুকি অঘোরে ঘুমিয়েছে দেখে তবেই খাট থেকে মা নেমে এসেছে।

"এই এক ঝামেলা বাপু ছেলেমেয়ে বড় হয়ে গেলে।"

"আর একটা ঘর থাকলেই হয়।"

"একটা কেন দুটো দরকার। খুকির বিয়ে হলে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে। কিন্তু এদের দুজনকে বিয়ে দিয়ে বৌ এনে রাখবে কোথায়?"

"ছাদে দুটো ঘর অবশ্য তোলা যায়। তবে এদের বিয়ে হতেতো এখনো অনেক দেরি।"

"ততদিনে পাঁচ টাকার জিনিস পঞ্চাশ টাকায় দাঁড়াবে। এখন করলে তবু ভাড়াটে বসান যায়। মাস মাস অন্তত একশো টাকা তাহলে আসে।"

"আমি ভাবছিলুম শ্রীরামপুরে একবার যাব কি না। ছেলেটার

প্রসপেক্ট আছে। দুবছরের মধ্যেই অফিসার হয়ে যাবে, বংশটাও ভাল।"

"বড্ড বড়োলোক বাপু এরা, খরচ করতে করতে পরে জেরবার হতে হবে। শুধু বিয়েতে খরচ করলেই তো চলবেনা। এই বাড়ির একটা বৌ আফিং খেয়েছিল কেন খোঁজ নিয়েছিলে কি? তার থেকে বরং শ্যামপুকুরেরটি ভাল। দোজবরে তো কি হয়েছে? অবস্থাপন্ন, কলকাতায় নিজের বাড়ি, খাঁইও একদম নেই। আমার যা গয়না আছে তাই ভাঙিয়েই হয়ে যাবে।"

"লোকটার বয়স খুকির দুগুণ। দুটো ছেলেও আছে।"

"আছে তো কি হয়েছে? খুকির অত বাছবিচার নেই, যা দেবে মেয়ে আমার সোনামুখ করে নেবে।"

পাশের ঘরে খুকির দাদা-বৌদি প্রথামত দাম্পত্য-ক্রিয়া সেরে চিত হয়ে বিশ্রাম করছে। একটা আরশুলা ফরফর করে উড়তে শুরু করল। দুজনে তখন খুব বিরক্ত হয়ে বলতে লাগল: "এঁদো ঘরে মানুষ থাকতে পারে?"

"নোনা লেগে ইঁটগুলো পর্যন্ত ক্ষয়ে গেছে।"

"এর থেকে নতুন বাড়িতে ভাড়া থাকাও ভাল।"

"এরপর তো ঘরে কুলোবে না, তখন কি হবে?"

"বেরোতে হলে এখনই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু বাড়িভাড়া টানার মত রোজগার না হলে—আলাদা থেকে সংসার চালানো যে কি অসম্ভব ব্যাপার।"

"আজ বলেছিলুম দাদার সঙ্গে ব্যবসায় নামার কথাটা। একদম গা করল না। মনে হয় কোনো মতলব আছে ওনাদের।"

"যে মতলবই থাক, খরচ করতে গেলেই নজরে পড়বে। তখন ক্যাঁক করে পুলিশ ধরবে, পেলে কোথায়? কি জবাব দেবে তখন? অবস্থা তো সবাই জানে। বাসনমাজার ঝিতো আমার বিয়ের পর রাখা হল।"

"বুঝিয়ে বলো না। ড্রামের মধ্যে রেখে তো কোনো লাভ নেই বরং নিজেদের লোকের সঙ্গে ব্যবসায় খাটালে কিছু আসবে। মিনমিন করলে কি চলে! এখন নয় একটা ছেলে তারপর আরও তো হবে, বাবা মা আর কদ্দিন!"

"বলার সুযোগ যে পাচ্ছিনা।"

পরদিন অফিস যাবার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে খুকির দাদা মোড়ে দাঁড়িয়ে রইল। একটু পরে বাবাও অফিসে বেরলো। দুজনে দেখা হতেই কথা শুরু হল:

"কাল বড়শালার সঙ্গে দেখা হল। ব্যবসাটাকে বড় করতে চায়। কিছু টাকা দিয়ে যদি পার্টনার হওয়া যায়—তুমি কি বল?"

"ভালই তো, কিন্তু টাকা পাবি কোথায়?"

"ড্রামের মধ্যে না পচিয়ে কাজে লাগাতে তো হবে।"

"খুকির বিয়ে দিতে হবে। আবার তোর মা বলছে ছাদে দুটো ঘর তুলতে।"

"ভালই তো। কিন্তু খরচ করতে দেখলেই তো কথা হবে হঠাৎ এত টাকা এল কোত্থেকে!"

"তা বটে। আচ্ছা ভেবে দেখি।"

ভেবে দেখতে গিয়ে এক সপ্তাহ কেটে গেল। তারমধ্যে খুকির মা ও বৌদির কথা প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। বাবা ও দাদা অফিস যাবার সময় ট্রাম-স্টপে প্রতিদিনই তর্ক করে যাচ্ছে। সংসার খরচের টাকা যেভাবে খরচ হওয়া উচিত তা হচ্ছেনা, এই যুক্তিতে দাদা চিৎকার করে মা-র সঙ্গে ঝগড়া করল পরপর তিনদিন। দুটো ঘর থেকেই ভাঁড়ারের দরজা দেখা যায়। দুই ঘর থেকে পালা করে সারারাত ভাঁড়ার ঘরের দিকে সন্দেহকুটিল চোখ পাহারা দিতে শুরু করেছে। আর খুকি, দুপুরে ঘরের জানলা বন্ধ থাকে তাই, ছাদে উঠে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। চড়াই বা পায়রা দেখলে শুধু নাকের পাটা ফুলোয়।

কালো কাচের চশমাপরা, টেরিলিন ট্রাউজার্স ও জামা গায় ছিপছিপে, শ্যামবর্ণ, মোটামুটি সুদর্শন একটা লোক গলির বাঁকটায় দাঁড়িয়ে তার দিকেই যে তাকিয়ে আছে খুকি প্রথমে বুঝতে পারেনি। যখন বুঝল দেহটা কাঁপতে শুরু করল। পাঁচিল থেকে কনুইটা নামাবে সে শক্তিও নেই। লোকটা আস্তে আস্তে বাড়ির সামনে দিয়ে বস্তির দিকে চলে যেতে, তখন দেহের উপর নিয়ন্ত্রণক্ষমতা ফিরে পেল খুকি। হুড়হুড়িয়ে সে নিচে নেমে এল।

রাত্রে দালানে, এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে থাকতে কথা চলে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্য : "ভুল দেখেনি তো খুকি ?"

"না না, আমাদের বাড়ির দিকে তাকাতে তাকাতেই তো চলে গেল। লুঙ্গি আর পাঞ্জাবিপরা, নাকটা থ্যাবড়া, কোমরে কিছু একটা গোঁজা ছিল বলে ওর মনে হল।"

"ছাদে কি কত্তে দাঁড়িয়ে থাকে অতবড় মেয়ে ? তোমরা একটু নজরও রাখনা ?"

"আহাহা, দুখানা ঘরের মধ্যে সারাদিন বন্দী থাকবে নাকি ? একদিন থাকোনা তুমি বুঝতে পারবে।"

"থাক থাক, এখন এই নিয়ে ঝগড়া করে লাভ নেই। সত্যি যদি সেই গুণ্ডাটাই হয় তাহলে কি করা যায় এখন ? নিশ্চয় ফেরৎ নিতেই এসেছে।"

"পুলিশে ধরিয়ে দিলেই তো হয়।"

"না না, তাহলে ফাঁসিয়ে দেবে। নিজে যদি বঞ্চিত হয় তাহলে অন্যকেও পেতে দেবে না, এ তো সহজেই বোঝা যায়।"

"তাহলে ওকে কিছু দিয়ে দিলেই হয়। থলেটা যদি জানলা গলিয়ে না ফেলত তাহলে ধরা পড়তে পারত। তাহলে টাকাও যেত, প্রচুর মার খেত আর ফাঁসি তো হতই। এই বাড়িই ওকে বাঁচিয়েছে বলা যায়। এখন ও কোন মুখে দাবি করতে পারে ?"

“কিন্তু গুণ্ডার কি ধর্মবোধ থাকে? দাবি সে করবেই। এর জন্য একটা মানুষ পর্যন্ত খুন করেছে সেটা ভুলে যেওনা। আমাদেরও খুন করতে পারে।”

“তাহলে দিয়ে দেওয়াই ভাল।”

“না না, গুণ্ডার দাবির কাছে মাথা নোয়াতে হবে নাকি? আর দেবারই যদি ইচ্ছে হয়, বেশ, তাহলে আমাকেই দাও। আমি বোঝাপড়া করে নেব।”

“তারপর এ বাড়িতে বোমা ফেলুক, রাস্তায় ছুরি মারুক। তোর জন্যে আমরাও মরি আর কি?”

“টাকাগুলো পেলে কালকেই এ বাড়ির ওপর সব দাবি ছেড়ে চলে যাব। তখন তো আর তোমাদের ভয়ের কিছু থাকবেনা।”

“তা হয় কখনো! হঠাৎ বাড়ি ছাড়লে লোকে বলবে কি?”

“আরে রেখে দাও তোমার লোক। দু-চারদিন বলাবলি করে তারপর সব ভুলে যাবে।”

“তাহলেও একটা কারণ না দেখালে কি চলে? জিজ্ঞেস করলে কিছু তো একটা আমাদের বলতে হবে!”

“মিথ্যেবলার কি দরকার, বলে দেবেন বনিবনা হচ্ছিল না। ঝগড়াঝাটি নিত্যিই তো লেগেছিল, তাই আলাদা হয়ে গেল। কদিন নয় লোক জানিয়ে গলা ছাড়া যাবেখন।”

“সবই তো বুঝলুম। কিন্তু গুণ্ডা বুঝবে কি করে যে, টাকা তোমরাই নিয়ে যাচ্ছ আমাদের কাছে নেই?”

“এ আর এমন কি শক্ত, গোড়াতেই তো আর ছুরি-বোমা মারবে না। যখন দাবি জানাতে আসবে বলে দেবে।”

“কিন্তু এ বাড়ির ওপর সব স্বত্ব আগে উকীল দিয়ে লেখাপড়া করে ছাড়তে হবে। মুখের কথায় চলবেনা।”

সকালেই বাবা এবং দাদা উকীলের কাছে গেল। তিনি খুব ব্যস্ত ছিলেন তাই বলে দিলেন সন্ধ্যায় আসতে, খসড়া তৈরি করে

দেবেন, পরদিনই রেজিস্ট্রি হবে। তারপর বাড়িতে তুলকালাম একটা ঝগড়া হবে বলেও ঠিক হয়ে রইল।

খুকির ছোট দুই ভাই সেইদিনই স্কুল থেকে ফিরে জানাল, মোটামুটি ভাল দেখতে ছিপছিপে ময়লা রঙের একটা লোক রাস্তায় তাদের কাছে খোঁজ নিচ্ছিল, বাড়িতে কে কে আছে, বাবা-দাদা কখন আসে, জানলায় যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে থাকে তার নাম কি ইত্যাদি। ওদের চায়ের দোকানে নিয়ে কাটলেট খাওয়াতে চেয়েছিল তবে ওরা যায়নি।

শুনেই মা ও বৌদির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে এল, ছোট ভাই দুটিকে বিকেলে বেরোতে বারণ করা হল। কিন্তু উপযুক্ত কারণ দর্শাতে না পারায় তারা এই নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে বেরিয়ে গেল। কিছু একটা ঘটবে আশঙ্কা নিয়ে মা ও বৌদির মধ্যে বলাবলি হল: "ব্যাটাছেলেরা কখন থাকে না-থাকে সেটা জেনে নিচ্ছে!"

"পই পই বলি অফিস থেকে সোজা বাড়ি চলে আসবে, আড্ডায় জমে যেওনা। এখন যদি বাড়িতে দল নিয়ে আসে তাহলে?"

"আজ উকীলের কাছে যাবার কথা আছে না? খুব জোরে চেঁচালেই হয়তো পালিয়ে যাবে। দিনেরবেলায় অত সাহস হবেনা।"

"বাঃ, দিনের বেলাতেই তো কাণ্ডটা ঘটিয়েছিল, সেটা ভুলে যাচ্ছেন কেন? ওদের কাছে কিবা দিন কিবা রাত।"

"তুমি হাতের কাছে কয়লাভাঙার লোহাটা বরং রাখ।"

এই সময় দুজনেরই মনে হল সদরের কড়াটা বোধহয় কেউ নাড়ল। একটা সচিত্র সিনেমা পত্রিকা হাতে খুকি ছাদে উঠে রয়েছে। বৌদি ছুটে রান্নাঘরে গেল। মা পড়িমরি ছাদে উঠে দেখল খুকি পাঁচিলে হেলান দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে। তাকে দেখামাত্র বইটায় মন দিল। কিছু না বলেই মা নেমে এল। বৌদি কয়লা-ভাঙা লোহা হাতে দাঁড়িয়ে।

"কেউ না।"

"কি করে বুঝলেন ?"

"খুকি তো দিব্যি দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছে, নইলে তো ছুটে নেমে আসত সেদিনের মত।"

"আমার শরীর যেন কেমন কচ্ছে। সন্ধ্যে হয়ে এল বাড়িতে একটা ব্যাটাছেলেও নেই।"

"খুকিকে বরং ডাকি।"

এই সময় ওদের মনে হল আবার যেন কড়া নড়ে উঠল।

"আলুওলা নয়তো, বলেছিল বিকেলে দাম নিতে আসবে।"

"তুমি গিয়ে দেখ না।"

"আপনি যান না। খেয়ে তো আর ফেলবেনা।"

অবশেষে মা গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বার কয়েক "কে কে" বলে চেঁচাতে আবার খুটখুট কড়া নড়ে উঠল। খিলটা খোলামাত্র হট করে দরজা ঠেলে একটা লোক ভিতরে ঢুকেই বলল, "চেঁচাবেন না।" দরজায় খিল দিয়ে বলল, "আমার থলি আর টাকা নিতে এসেছি। চটপট দিন। চেঁচালে সবাইকেই খুন করে যাব।"

এমন আকস্মিকভাবে ব্যাপারটা হয়ে চলল যে ওরা দুজন একপা হটার কথাও ভাবতে পারলনা। ছোরার ডগাটার দিকে শুধু তাকিয়ে থাকল। শেষে বৌদিই বলল, "টাকা তো আমাদের কাছে নেই। পুলিশে জমা দিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

"বাজে কথা রাখুন। সব খবর রাখি। টাকা এই বাড়িতেই আছে। চটপট বার করুন, জানেনতো এর জন্যে খুন পর্যন্ত হয়ে গেছে। আরো খুন হতে পারে।"

"টাকা বাপু, আমার বড়ছেলে নিয়েছে। আমরা ও টাকা চাইনা।"

"মিথ্যে কথা। হাত দিয়েও উনি টাকা এখন পর্যন্ত ছোঁননি, আর কিনা ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছেন ?"

"কেন, ওকি টাকার বদলে বাড়ির অংশ ছাড়বে বলেনি ?"

"ছাড়ুক, তবেতো টাকা পাবে। আগেই বলছেন কেন টাকা

নিয়েছে? দশহাজার টাকার বদলে পনেরহাজার টাকার বাড়ির অংশ নিচ্ছেন, এতবড় জোচ্চুরির পরও কিনা বলছেন আপনার ছেলে টাকা নিয়েছে?"

"টাকা যে দেওয়া হচ্ছে এই ওর ভাগ্যি। বাড়ি ওর বাপের, সে যদি উইল করে ওকে বঞ্চিত করে তাহলে ও কি করবে শুনি?"

"করে দেখুননা। কোর্টে গিয়ে আদায় করব।"

"তোমার চোদ্দপুরুষের সাধ্যি নেই আদায় করে।"

"মুখ সামলে কথা বলবেন বলছি।"

"চুপ কর হারামজাদি।"

এরপর বৌদি কয়লাভাঙার লোহাটা ছুঁড়ে মারে। মা কপাল চেপে ঘুরে পড়ে বারকয়েক হাত পা খিঁচিয়েই নিথর হয়ে গেল দেখে গুণ্ডাটা ছুটে এল। নাড়ি টিপে, চোখের পাতা তুলে, বুকে কান রেখে সে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "একেবারে মার্ডার করে দিলেন! যাক্ চটপট আমার থলেটা বার করে দিনতো চলে যাই।"

"আমি এখন কি করব?"

"আমি কি জানি। আমার থলেটা দিন।"

"ডাক্তার ডাকব?"

"বললুম তো জানিনা।"

"পুলিশ?"

"কি বলবেন ডেকে! খুন করেছি? তাহলে তো আপনার ফাঁসি হবে।"

এই সময় ছাদ থেকে খুকি নামল। মাকে রক্তের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখে হাউ হাউ করে উঠে বলল, "ওমা কে তোমার এমন কাণ্ড করল।"

"ওই তো, ওই লোকটা, সেই গুণ্ডাটা।"

বৌদির আঙুলতোলা দেখে গুণ্ডাটা খুব ঘাবড়ে গেল। "তার মানে, এসব কি কথা?" বলতে বলতে পিছোতে শুরু করল। খুকি

চিৎকার করে ছুটে গিয়ে লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে বৌদিও ছুটে গেল।

"জানো ঠাকুরঝি খটাং করে লোহাটা দিয়ে মারল। কি রকম শব্দ যে হল!"

খুকিকে একহাতে আটকে গুণ্ডাটা খিল খুলতে যাচ্ছে, বৌদি খিল চেপে ধরে বলল, "আবার আমার ঘাড়ে দোষ দেবার চেষ্ট করছে। কি বদমাস দেখেছ!"

"মা কালীর দিব্যি, আমি করি নি।"

"না করোনি, পাজি গুণ্ডা কোথাকার। টাকা দিন নইলে খুন করব বলে ওটা ছুঁড়ে মারলে না?"

চিৎকার করতে করতে খুকি জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছে। গুণ্ডাটা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে। খুকির চিৎকারে আশপাশের বাড়ির জানলায় ছাদে উঁকি শুরু হয়ে গেছে। সদর দরজার কাছে কাদের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। গুণ্ডাটা হঠাৎ সম্বিৎ পেয়ে এধার ওধার তাকিয়েই ছাদে যাবার জন্য ছুটলো সিঁড়ির দিকে। বৌদিও পিছু নিল।

"পালাচ্ছো নাকি? কোন উপায় নেই, ছাদ দিয়ে শুধু রাস্তায় লাফিয়ে পড়া যায়। সেখানে এখন লোক।"

"তাই যাব। ছুরি দেখিয়ে পালাব।" মরিয়া হয়ে গুণ্ডাটা বলল।

"আমার কি দোষ! চোদ্দপুরুষ তুলে গালাগাল দিলে রাগ হবে না? তোমার হতো না?"

গুণ্ডাটা জবাব না দিয়ে কয়েকধাপ ওঠা মাত্র বৌদি ওর জামা টেনে ধরল। "এখন তোমায় আমি যেতে দিতে পারিনা। খুনী তোমায় হতেই হবে। ফাঁসি অবধারিত তোমার।"

"তাহলে পুলিশকে বলব লুটের টাকা এ বাড়িতে আছে।"

"তার আগেই সরিয়ে ফেলব অন্য কোথাও।"

"এখুনি চেঁচিয়ে সবকথা লোকেদের বলে দিচ্ছি। ফাঁসি যখন

হবেই আর পরোয়া কিসের। তবে আপনাদেরও ও টাকা ভোগ করতে দোব না।”

“কিন্তু তাই বলে আমি ফাঁসি যেতে রাজি নই, তোমাকেই ফাঁসি যেতে হবে। লোকে সহজেই বিশ্বাস করবে তোমার পক্ষে খুন করা স্বাভাবিক। টাকা আমরা পাব না, কিন্তু তুমি টাকা আর প্রাণ দুটোই হারাচ্ছো, লোকসান তোমারই বেশি।”

এই শুনে গুণ্ডা খুবই বিচলিত হয়ে সিঁড়িতে বসে পড়ল। সদরের কড়া নাড়ছে প্রতিবেশিরা। “কি হল”, “কি ব্যাপার” প্রভৃতি ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। খুকির জ্ঞান এখনো ফেরেনি।

“এখন আর ভাবনা করার সময় নেই। বরং এক কাজ করা যাক, তোমার প্রাণ বাঁচিয়ে দিচ্ছি, টাকার দাবিটা ছেড়ে দাও। মনে রেখ, বেঁচে থাকলে হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ টাকা রোজগার করতে পারবে। ঠিক বলেছি কিনা?”

গুণ্ডাটি এইবার ফিকফিক করে হেসে মাথা হেলাল। সদরে দুমদুম ঘুঁষি পড়ছে। বৌদি ছুটে গিয়ে দরজা খুলেই চিৎকার করে উঠল, “সব্বোনাশ হয়ে গেছে, শিগ্গির ডাক্তার ডেকে আনুন। মা মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন। ব্লাডপ্রেসার ছিল। রকের কানায় মাথাটা ঠকাস করে লাগল, উফ্ কিরকম শব্দটা যে হল!”

এই বলে বৌদি উচ্চৈস্বরে কাঁদতে লাগল। প্রতিবেশিরা ছুটো-ছুটি শুরু করে দিল। ডাক্তার এল, অ্যাম্বুলেন্সও। মাকে হাসপাতালে পাঠান হল। খুকির জ্ঞান ফিরে এসেছে, তাকে ঘরে শোয়ান হল। জনৈক প্রতিবেশির প্রশ্নের উত্তরে বৌদি জানাল, “খুকির বিয়ের সম্বন্ধ এক জায়গায় ঠিকঠাক। এইমাত্র জানিয়েছে, মেয়ের মাথা খারাপ আছে বলে তারা নাকি খবর পেয়েছে। তাই শুনেই মা—”

খুকির আচ্ছন্নতা তখনো কাটেনি। ফ্যালফ্যাল চোখে জানলার দিকে তাকিয়ে, সকলের কথাবার্তা তখন তার কাণে বকম-বকমের মত মনে হতে লাগল।

ছ'টা পঁয়তাল্লিশের ট্রেন

মাঘের দুপুরে, যদি, তকতকে ঘাসে পা দিয়েই মৃদু তাপ লাগে, পোড়া পেট্রোলের গন্ধ আসে, একটি কি দুটি লোক বিরাট মাঠটা একাকী পার হতে থাকে, উপুড় হয়ে পুকুরধারে কেউ ঘুমোয় এবং হঠাৎ শঙ্খচিলের ডাক শোনা যায়—তখন ইচ্ছা করে "এবার একটু বসা যাক।" বিনোদ গড়ের মাঠের দিকে মুখ-করা বেঞ্চটা দেখিয়ে বলল।

"হ্যাঁ, অনেক হেঁটেছি।" বলেই কমলা আগে গিয়ে বসল। সিঁথিতে, কপালে দগদগে তেল-সিঁদুর। খোকা এবার স্কুল-ফাইনাল দেবে। তার জন্যই কালিঘাটে পুজো দিতে কলকাতায় আসা। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল থেকে জাদুঘর পর্যন্ত সবাই হেঁটে গেছে। এবার মনুমেণ্ট দেখার কথা। সীতা আঙুল দিয়ে পীতু-নীতুকে তা দেখিয়ে দিল, "ওই যে।"

একজন ফিসফিস করে বলল, "আমরা ওর কাছে যাবো না?"

"এখান থেকেই তো দেখা যাচ্ছে।"

ওরা দুজন আর কথা বলেনি। মুখ ফিরিয়ে বসে রাস্তায় গাড়ি চলাচল দেখতে লাগল। কিছুদূরে গাছের ছায়ায় একজোড়া ছেলে-মেয়ে গল্প করছে আর মেয়েটি খুব হাসছে। সীতা তাদের দিকে মুখ করে বসল। কমলা ঠেস দিয়ে মুখটা আকাশমুখো করে চোখ বন্ধ করল। তার সারাঅঙ্গে ক্লান্তি। খোকা একটু অধৈর্য হয়েই বলল, "কতক্ষণে বসবে?"

বিনোদ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "যাবোই বা কোথায় ?"

খোকা উঠে দাঁড়াল। পকেটে হাতভরে কয়েক পা এগিয়ে একটা ভাঁড়কে লাথি মারল। সেটা ভেঙে যেতে আর কোনো কাজ না পেয়ে মাঠের মধ্যে এগিয়ে গেল।

খোকার থুতনিতে কেশ দেখা দিয়েছে, কণ্ঠস্বরে কর্কশতা এসেছে, দুই পায়ে ঘনরোম। বাহুর পেশী আকৃতি নিচ্ছে। এবার প্রথম একটা বড়ো পরীক্ষায় বসবে। এখন ও কি রকম বোধ করছে, সেইটা জানতে বিনোদের সাধ হল। তাই সেও উঠে পায়চারী করতে করতে খোকার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

"তোর মা বড্ড হাঁপিয়ে পড়েছে, একটু জিরোক। তুইও বোসনা, সকাল থেকে তো বোসতে দেখলুম না।"

খোকা কথাটা গায়ে মাখলোনা। দূরে রাস্তার ওপারে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে সেই দিকে তাকিয়ে। একদল মেয়েপুরুষ, বিনোদের মনে হল তারা বেহারী, এমন ভাবে বাসে উঠল যেন স্টেশনে এক মিনিটের জন্য থামা ট্রেনে উঠছে। বাস ছাড়ার পর দেখা গেল একজন চেঁচিয়ে বাসের পিছনে ছুটতে শুরু করেছে। বিনোদের ভারি হাসি পেল।

"খোকা দেখলি না, একটা ব্যাপার।"

ঘটনাটা বিনোদ বলল। খোকা প্রয়োজনমতো হেসে খেলায় মুখ ফেরাল। বিনোদও সেই দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শ্রান্ত বোধ করতে শুরু করল। তার ইচ্ছে হল ঘাসে পা ছড়িয়ে বসতে।

"কলকাতাতেই খেলার সুবিধে, কত ক্লাব।" খোকা স্বগতোক্তির মতো করে বললেও বিনোদ জবাব দিল, "আমাদের ছেলেবেলায় এত কিছু ছিলনা। ঘোষেদের মস্ত উঠোন ছিল, সেখানে ব্যাডমিণ্টন থেকে শুরু করে সব খেলা হত। পাড়ায় বাইরে যাওয়ার দরকারই হতনা।"

খোকা শুনছিল, হঠাৎ খেলার মাঠ থেকে চীৎকার উঠল। একজন

আউট হয়ে ফিরে যাচ্ছে। আউটের পদ্ধতিটা দেখতে পায়নি তাই বিরক্ত হয়ে খোকা বলল, "তুমি বরং ওদের কাছে গিয়ে বোসো।"

বিনোদ অপ্রতিভ বোধ করল। কথা না বলে গুটিগুটি ফিরে এল।

পীতু ফিসফিস করে সীতাকে জিজ্ঞাসা করল, "দিদি, এবার আমরা কি দেখতে যাব?"

"চিড়িয়াখানা?" নীতু বলল।

"জানিনা, বাবাকে জিগেস কর।" সীতার হাই উঠছে! ছেলেমেয়ে ছুটো খালি কথাই বলে যাচ্ছে। দেখে দেখে আর দেখতে ভাল লাগছেনা।

"চিড়িয়াখানা আরো সকালে যেতে হয়।" বিনোদ উত্তরটা দিয়ে দিল। কিন্তু ছেলেছুটির মুখ দেখে তার মায়া হচ্ছে: বলল, "অন্য কোথাও অবশ্য যাওয়া যায়।"

"সিনেমা?" সীতা চট্‌ করে বলল।

"এখন শো আরম্ভ হয়ে গেছে। তাছাড়া এখানে তো ইংরিজি বই দেখায়।"

বিনোদ মুখ ফিরিয়ে নিল, যাতে সীতা প্রসঙ্গটা টানতে না পারে। খোকাকে দেখতে পেল সে। একটা ঢিল কুড়িয়ে সামনে জোরে ছুঁড়ল। ঘাড় ফিরিয়ে এদিকেই তাকাল। ও যেন প্রস্তুত ঘোড়ার মতো ছটফট করছে। শুধু গন্তব্যটা জানতে পারলেই হয়।

পীতু ফিসফিস করে বলল, "আমরা কি এবার বাড়ি ফিরব?"

বিনোদ উঠে দাঁড়াল।

"চল্‌, একটা জিনিস দেখাব।"

ওরা তাকাল।

"আমাদের বাড়ি দেখাব, খোকাকে ডাক।"

কমলা কথা বলেনি এতক্ষণ। এবার বলল, "কোন্‌ বাড়ি? যেটা ছিল?"

কথা না বলে বিনোদ বাস স্টপের দিকে এগিয়ে গেল।

"ও-ছাই দেখে কি লাভ। তারচেয়ে আর একটু বসে থাকলেই হোত।"

গজগজ করে কমলা উঠে দাঁড়াল। পীতু ছুটে গেছে খোকাকে ডাকতে। সীতা বলল, "সেদিন মেট্রোয় সিনেমা দেখে গেছে বি-ডি-ও'র বড়োমেয়ে।" বাস স্টপে দাঁড়িয়ে খোকা বলল, "এসব ক্লাবে আমিও খেলতে পারি।"

বাসে ওঠা পর্যন্ত বিনোদ কারুর দিকে তাকালনা।

এখনো অফিস ছুটির ভীড় আসেনি। বিনোদ বাসে জানলার ধারে বসল। ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বাসটা চলেছে। ঢুলুনি লাগছে। সে যে কত ক্লান্ত এইবার টের পেল। আরাম পাবার জন্য চোখ বুঁজল। মাঝে মাঝে খুলে দেখে একটা-ছুটো গাছ, একটু ঘাস-মাটি, জমাটবাঁধা ধূসর বাড়ি। কানে বাজছে বাসের ঘণ্টি, এঞ্জিনের শব্দ আর অনবরত প্রবল এক সাঁইসাঁই অতিক্রম ধ্বনি। বিনোদ ভিতরে ভিতরে ভার বোধ করতে শুরু করল, যেন দমে যাচ্ছে। পিছিয়ে যাচ্ছে।

"জানলা দিয়ে মুখ বার কোরোনা, পীতু নীতু।"

কমলার গলা শোনা গেল। চোখ খুলে বিনোদ দেখল সামনের লোকটি ঘাড় হেঁট করে কি যেন পড়ছে। পাশেরজন জর্দা-পান চিবোতে চিবোতে শূন্য চোখে সামনে তাকিয়ে। ব্যস্ত হয়ে একজন উঠে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আরএকজন সেখানে বসল। বাইরে ট্র্যাফিকের লাল আলোটা জ্বলজ্বল করছে। স্থির বাসটার গোটাদেহ এঞ্জিনের ধ্বক্‌ধ্বকানির সঙ্গে কাঁপছে। বিনোদের মনে হল, সপরিবারে কোথায় যেন চেঞ্জে চলেছে। স্টেশ্যনের পর স্টেশ্যন পার হয়ে যাচ্ছে। যাত্রীদের ওঠা-নামা চলেছে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়াতেই কয়লার গুঁড়ো চোখে পড়ল। মা তখন বললেন, 'বারণ করেছিলুম জানলা দিয়ে মুখ বার করিসনা।' আঁচলটাকে সলতের

মতো পাকিয়ে চোখের মধ্যে অনেক খুঁজলেন। ফুঁ দিলেন। শেষে কাপড় দলা করে মুখের ভাপ দিয়ে চোখে চেপে ধরলেন। মা জর্দা খেতেন। গন্ধটা তখন সুন্দর লাগছিল।

'তোর মেজোকাকার চোখে একবার কয়লার গুঁড়ো পড়ে, সেকি কাণ্ড।' এই বলে জানলার কাঁচ নামিয়ে দিয়ে মা হেসে বললেন, 'আর ভয় নেই।' তারপর একটা পান মুখে দিয়ে পাশে বসলেন। আমরা দুজনে একই জানালা দিয়ে দৃশ্য দেখতে লাগলাম। পিচ ফেলার জন্য মা একবার কাঁচটা তুলেছিলেন। বাবা চুরুট মুখে একটা ইংরিজি বই কখন থেকে পড়েই চলেছেন। মা ফিসফিস করে বললেন, 'নন্তু, তোর বাবাকে বলনা, বই রেখে এখানে এসে বসতে।' বাবাকে বলতেই হেসে কেমন করে যেন মার দিকে তাকালেন। মা ঘোমটা বাড়িয়ে চোখ সরিয়ে নিলেন। তারপর তিনজনে সেই কাঁচফেলা জানলাটি দিয়ে বাইরের গাছ, চাষী, কুঁড়ে-ঘর, মেঠোপথ আর পথিকদের দেখতে লাগলাম। এইভাবেই একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম মা'র কোলে।

অন্ধকারে ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে স্টেশ্যনে নামলাম। ওয়েটিং রুমে মা মাথা মুছিয়ে দিয়ে চা খেতে চাইলেন। বাবা বাইরে বেরিয়ে চা আনলেন। আমিও খেলাম। বাবা বললেন, 'নন্তু, আর একটা জিনিস দেখাব, কখনো দেখিস নি।'

প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এলেন। কি অন্ধকার চারিদিক। বাবার চশমার কাঁচে বৃষ্টির জল লেগেছে। স্টেশ্যনের ফিকে আলোয় তা জ্বলজ্বল করে উঠল।

'তাকা সামনে।'

তাকালাম। গাঢ় অন্ধকার চোখের সামনে ওৎ পেতে। তাকিয়ে তাকিয়ে ক্লান্ত হয়ে গেলাম।

'এবার উপর দিকে চোখ তোল।'

তাই করলাম। চোখ তুলতেই হঠাৎ ঠকঠক করে কেঁপে

গেলাম। সেই অন্ধকার এক জায়গায় শেষ হয়ে গেছে। সুতোর মতো আঁকা-বাঁকা ঘোলাটে আকাশ সেই অন্ধকারের মাথায় চর ফেলেছে। অন্ধকারটা মনে হল ভেঙে পড়বে বুঝি।

বাবা আঙুল তুলে বললেন, "ওটা হচ্ছে পাহাড়। ওখানে ঝর্না আছে। আমরা একদিন দেখতে যাব।" গানের সুরের মতো করে বাবা কথা বলেছিলেন।

অবাক হয়ে ছেলেমেয়েরা তাকাল। আঙুল তুলে বিনোদ বলল, "ওইটেই ছিল আমাদের বাড়ি।"

"কে আছে ওখানে?" নীতু জিজ্ঞাসা করল।

"লোকেরা থাকে।" সীতা বুঝিয়ে দিল। লোহার গেটের একটি মাত্র পাল্লা। দুপাশের পামগাছ দুটি ন্যাড়া। ফুলবাগানটায় পুরনো ড্রাম স্তূপ হয়ে রয়েছে। দোতলার বারন্দায় কাঠের পার্টিশান। রেলিঙে নানান ধরনের কাপড় শুকোচ্ছে। বাড়িটায় বহুবছর কলি হয়নি, কিন্তু দাগরাজি দেখা যাচ্ছে। ভাঙা পাইপ দিয়ে তিনতলা থেকে ছড়ছড় করে জল পড়ল। দোতলার কার্নিশে একটা বেড়াল মাথা বাঁকিয়ে কি চিবোচ্ছে, সম্ভবত চড়াই। সদর দরজা খোলা। রাস্তা থেকেই দেখা যায়, অনেকগুলি মেয়েমানুষ, বাসনমাজা, কাপড়কাচার কাজ করছে। উঠোনে আগে জলের কল ছিলনা। দোতলায় হঠাৎ চীৎকার করে কে খিস্তি করল।

"দোতলার ওই বারান্দার পেছনেই হলঘর। বাবা বসতেন।"

"বসে কি কর্‌ত?" পীতু জানতে চাইল।

"গান হত, রিহার্সাল হত, পাড়ার পুজোর মিটিং হত। একতলার ওই ঘরটা ছিল মেজোকাকার সেরেস্তা। ছোটকাকা মরে যেতে ওর বৈঠকখানাটা মেজকাকা নেয়। তখন খুব মক্কেল হয়ে গেছে।"

বাড়ি থেকে একটা লোক ওদের লক্ষ করছিল। বিনোদ আঙুল দিয়ে দিয়ে নির্দিষ্ট করে দেখাচ্ছিল। তার দিকে আঙুল তুলতে দেখে বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করল, "কাকে খুঁজছেন?"

বলার ভঙ্গিতে বিনোদ হকচকাল। পীতুই বলে ফেলল, "আমাদের বাড়ি দেখতে এসেছি।"

ভ্রূ কুঁচকে লোকটি সপরিবার বিনোদকে দেখল। চোখেমুখে বিস্ময় ও অস্বস্তি ফোটাল। কিন্তু যখন বিনোদ বলল, "এটা এককালে আমাদেরই বাড়ি ছিল।" লোকটি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

"বেচে দিয়েছেন!"

বিনোদ ঘাড় কাত করল।

"বেচবার আর লোক পেলেননা? খোঁয়াড়, মশাই খোঁয়াড়। জানোয়ার হয়ে বাস করছি। এদিকে ভাড়া নেয় সত্তর টাকা করে।"

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে লোকটি বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। বিনোদ রেগে গেল।

"বেলে পাথরের উঠোন আর সিঁড়ি, মার্বেল পাথরের হলঘর, কত বড়ো বড়ো জানলা দক্ষিণমুখো—" খোকার দিকে তাকিয়ে সে বলল, "এই বাড়িকে বলে কিনা খোঁয়াড়! এ রকম বাড়িতে যে বাস করছে এটাই ব্যাটার বাবার ভাগ্যি।"

কমলার দিকে সে তাকাল। আশ্চর্য, পিছন ফিরে কি যেন দেখছে। ধমকের মত করে বিনোদ বলল, "এদিকে দেখনা। ওই যে তিনতলায় খড়খড়ির জানলা, ওটা ঠাকুরঘর। ওর পিছনে ছাদ, দুটো ব্যাডমিন্টন কোর্ট হয়ে যায়।"

এক বুড়ো কাশতে কাশতে জানলাটায় এসে দাঁড়াল। কমলা মুখ ফিরিয়ে নিল। নিচুস্বরে সীতাকে বলল, "সকাল থেকেই ধকল চলেছে, আয় রকটায় বসি।"

"এভাবে, এখানে বোসোনা।" বিনোদের কথায় কমলা তাড়াতাড়ি পা নামিয়ে নিল। কিন্তু উঠলনা। এক বৃদ্ধ তখন যাচ্ছিল। বিনোদকে দেখে ইতস্তত করে কাছে এগিয়ে এল।

"হরিকা, আমি বিনোদ। নন্তু।"

"চিনতেই পাচ্ছিলুম না। চোখে তো আর ভাল দেখছিনা। তা তুমি যে দেখছি বুড়িয়ে গেছ।"

"বয়স তো হচ্ছে।" বিনোদ হেসে বলল।

ফোকলা মুখে বুড়ো হাসল। পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ে বলল, "একটা লোক ছিলেন বটে তোমার বাবা। কি অন্তঃকরণ! সারাজীবন শুধু দিয়েই গেলেন। একফোঁটা সাহায্যও কারুর কাছ থেকে নিলেন না। ভায়েদের মানুষ করলেন, তারা গাড়ি বাড়ি করল, আর তিনি?" দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুড়ো চুপ করল! বুকটা ফুলে উঠে টসটস করছে বিনোদের। খোকার দিকে তাকাল। শুনে নিক্। হরিকাকে তো আর সে বলতে শিখিয়ে দেয়নি।

"এইটি আমার বড়োছেলে, এবার স্কুল ফাইনাল দেবে।"

বিনোদ আশা করেছিল খোকা প্রণাম করবে। হরিকা হাজার হোক ব্রাহ্মণ। কিন্তু খোকা তার চোখ ইশারা অগ্রাহ্য করল।

"বেশ বেশ, বংশের মুখোজ্জ্বল কর বাবা। আমার ছোটনাতি গতবার বি-এস-সি পাশ করল। তোমার মেজোকাকার ছেলে ঘুনুকে ধরে কারখানায় ঢুকিয়ে দিয়েছি। লোক ভাল। পাড়ার সক্কলের কথা জিজ্ঞেস করল। তোমাদের কথাও। যাওনা বলে দুখ্যু করল।"

"বাবা কখনো কারো কাছে হাত পাতেননি। সেই রক্ত আমার গায়েও তো আছে।"

"তা বটে, তা বটে।"

সীতা এসে বিনোদকে ফিসফিস করে বলল, "মা বলছে, কখন ফিরবে?"

ট্রেনে ফেরার সময় কমলা বলল, "তোমার হরিকা রাস্তায় দাঁড়িয়েই কথা বলল, বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বসাতে তো পারত।"

"অবস্থা তেমন ভাল নয়, নইলে কি আর বলতনা। ওর বড়ো মেয়ের বিয়েতে সেকি কাণ্ড! পালঙ্ক দেওয়ার কথা ছিল দিতে

পারেনি। বরকে তো সভা থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল বরের বাপ। কান্নাকাটি পড়ে গেল। বাবা তখন জামিন থেকে নিজে দাঁড়িয়ে বিয়ে দেওয়ালেন। পরদিন বরের বাপের হাতে চারশো টাকা গুণে গুণে দিলেন। বুঝে ছাখ, সে আমলের চারশো টাকা মানে আজকের হু'হাজার টাকা।"

এতক্ষণ পরে খোকা মুখ খুলল, "দিয়ে কি লাভটা হোল!"

শোনামাত্রই ঝিমঝিম করে উঠল বিনোদের মাথা। চুপ করে রইল সে। কিছুক্ষণ পরে নিজেকে শুনিয়ে একবার শুধু বলল, "ঘুনু আর আমি একই ক্লাশে পড়তুম।"

কেউ শোনার জন্য আগ্রহ দেখালনা। নীতু মা'র কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঠাণ্ডা লাগছে তাই পীতু কুঁকড়ে বসে। কিন্তু বাবার কাছে গল্প শোনার জন্য জ্বলজ্বল চোখে তাকিয়ে। বিনোদ আর কথা বলেনি।

স্টেশ্যন থেকে রেললাইন ধরে প্রায় আধমাইল গিয়ে লোহা কারখানার পাশ দিয়ে গোপাল কুণ্ডু রোড। সেখান থেকে বিনোদের বাড়ির গলি তিন মিনিটের পথ। ওরা ট্রেন থেকে নামল তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে গেছে। দূরে সিগনালের লাল আলোটা জ্যাবড়া দেখাচ্ছে। লাইনের হুহাত উপরে কুয়াশা চাপ বেঁধে। ঘুমন্ত নীতুকে কোলে নিয়ে কমলা মন্থর হয়ে পড়েছে। পীতুর হাত ধরে বিনোদ শ্লিপারে পা রেখে ধাপে ধাপে এগোতে লাগল। এক একটা শ্লিপারের মধ্যে ফাঁক বেশি। পীতু পারছেনা দেখে ওকে সীতার কাছে গছিয়ে দিল। তখন কমলা বলল, "এখানেই তো পুরুতমশাই কাটা পড়েছে।"

খোকা বলল, "আরো এগিয়ে, ফুটবল মাঠের কাছে।"

কমলা বলল, "কি সাহস!"

বিনোদ বলল, "কিসের সাহস, মরার?"

"না গো, রাধামাধবের সোনার মুকুট চুরি করা কম সাহসের

কাজ। একটুও বুক কাঁপলনা! ধরা পড়ে গেল তাই, নয়তো কুষ্ঠ হয়ে যেত ওই হাতে।"

খোকা কমলার দিকে ফিরে বলল, "তুমি কি করে জানলে যে হোত?"

"তুই থাম্। পাপ করলে ভগবান শাস্তি দেবেনই। আত্মহত্যা করে ফাঁকি দিল তাই। কিন্তু ফাঁকি দিয়ে যাবে কোথায়, যমের দরবারে তো যেতেই হবে!"

বিনোদ কথা বললনা। ভাবতে শুরু করল ললিত ভট্চাজের কথা। একদিন এসে ভোট চাইল মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশ্যনের সময়। বিনোদ বলেছিল, ঠাকুরদেবতার সেবা নিয়ে থাকবে, তুমি আবার এই সবে মাতলে কেন? ললিত বলে, ঠাকুর তো দেশের মানুষ। তাদের সেবাই তো করতে চাই। খাসা বলেছিল। সবাই ওকে মান্য করত, কথা শুনতো! চুরি ধরা পড়ে অপমান এড়াতে ছ'টা পঁয়তাল্লিশের ট্রেনে গলা পেতে দিল। দেমাকী ছিল, দেমাক দেখিয়েই চলে গেল। এসব মানুষ আজকাল বড়ো একটা চোখে পড়েনা।

খপ খপ আওয়াজ হচ্ছে সকলের পা ফেলার। পাথরে আঙুল ঠুকে সীতা একবার যন্ত্রণায় কাতরে উঠল। কমলা ক্রমশই পিছিয়ে পড়ছে। দেখে দেখে সবাই পা ফেলছে।

"প্রিন্সিপল্ থাকা দরকার নাহলে এলোমেলো হয়ে জীবন কাটে।" চাপাস্বরে বিনোদ বলল খোকাকে। "বাবা একবার বলেছিলেন, তখন আমি খুব ছোটো। মেজোকাকার ভায়রা-ভাই যোগেন ঘোষ কর্পোরেশন ইলেকশ্যনে দাঁড়িয়েছিল। বাবার কাছে এলেন ভোট চাইতে। কুটুম বলে তো খুব আদর-যত্ন করে বসালেন। কিন্তু জানিয়েও দিলেন, কংগ্রেস ছাড়া আর কাউকে ভোট দেবেননা। মেজোকাকাও অনেক করে বললেন কিন্তু বাবা অটল। সারারাত ঘুমোলেন না, দোতলার বারান্দায় পায়চারী করলেন। পরদিন মেজো

কাকা কোর্টে বেরোচ্ছেন তখন ডেকে বললেন, যোগেনবাবু নিজে এসেছিলেন, কুটুম, তার মর্যাদা আছে, সেটা রাখতেই হবে। ওকে জানিয়ে দিও আমি কাউকেই ভোট দেবনা।"

একটানা গল্পটা করে বিনোদ প্রফুল্ল বোধ করল। খোকা মাথা নিচু করে দেখে দেখে হাঁটছে। পিছন থেকে সীতা চেঁচিয়ে বলল, "বাবা একটু দাঁড়াও, বড্ড এগিয়ে গেছো।"

কারখানার কাছে ওরা এসে পড়েছে। একটা পুরনো ঝাঁকড়া বটগাছের পাশ দিয়ে রাস্তাটা পূবে চলে গেছে। বিনোদ খোকাকে নিয়ে গাছটার নীচে দাঁড়াল।

কমলার প্রায় এলিয়ে পড়ার দশা। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "তোমরা তো জিন লাগিয়ে ছুটছ। আমি ওদিকে ভয়ে মরি।"

সীতা বলল, "ছ'টা পঁয়তাল্লিশের গাড়ি আসার সময় হয়েছে, মার খালি ভয় যদি আমরা কাটা পড়ি।"

"না বাপু, গাড়িটাড়ি নিয়ে খেলা নয়। ও হচ্ছে নিয়তির মতো। হাত দেখালেও থামবেনা, পাশ কাটিয়েও যাবেনা।"

কমলার বলার ভঙ্গিতে বিনোদের কৌতুক করার ইচ্ছা হল। সিগনালের রঙ সবুজ হয়ে রয়েছে। সে বলল, "তাহলে একটু দাঁড়াও। তোমার নিয়তি আসছে তাকে দেখে যাও।"

"না, না, চলো। ঠাট্টা করতে হবেনা।"

বিনোদ ওকে হাত ধরে টেনে রাখল। ছেলেমেয়েরা দেখছে লক্ষ করে কমলা ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় দূরে এঞ্জিনের হুইসেল বাজল।

সকলে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। গুম গুম শব্দ হচ্ছে। লাইনের উপরে পিছলে যাচ্ছে আলো। মাঠের মাঝে ইলেকট্রিকের লম্বা খুঁটির মাথা ঝকঝক করে উঠল। একটা শেয়াল ওদের কাছ দিয়ে ছুটে গেল।

"এসে গেছে, এসে গেছে।" বিনোদ কাঁপাগলায় অন্ধকারের

মধ্যে বলল। ফিসফিস করে পীতু বলল, "কি এসে গেছে বাবা ?"

"নিয়তি।"

বিনোদ কয়েক পা এগিয়ে গেল। পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া চাঙড়ের মতো হুড়দাড় করে ট্রেনটা এসে পড়েছে। বিনোদ দুহাত বাড়িয়ে শিশুর মতো কলধ্বনি দিয়ে লাইনের দিকে এগিয়ে গেল। কমলা ভয়ঙ্কর স্বরে চীৎকার করে উঠল। খোকা ছুটে গিয়ে বিনোদের কোমর জড়িয়ে ধরল। যখন, কামরাগুলোর আলো ওদের দেহ থেকে অদৃশ্য হল, মাটি স্থির হল, বাতাস শান্ত ভাবে বয়ে গেল, বটগাছের পাখিরা চীৎকার বন্ধ করল, নক্ষত্রের মালিন্যও ঘুচল, তখন বিনোদ বলল, "ভয় নেইরে, ও লাইন ধরে চলে। আমি ওর লাইনে যাচ্ছিনা।"

কমলা ফুঁপিয়ে বলল, "কবে তোমার পাগলামি থামবে ?"

হা হা করে হেসে বিনোদ বলল, "চলো চলো, এবার যাওয়া যাক।"

বাড়ি পৌঁছে খোকা পড়তে বসল। আধাদামে কেনা গতকালের খবরের কাগজ নিয়ে বিনোদ ওর কাছে বসে পড়ছে আর মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে। খোকা কিছু একটা মনে করে রাখতে ভ্রু কোঁচকাচ্ছে থুতনিতে হাত রেখে ঠোঁট কামড়ে টেরিয়ে রয়েছে, হুবহু ওর ঠাকুরদার মতো। সারা মুখ এ সময় একটা দম্ভের মতো দেখায়। আত্মপ্রত্যয়ে কঠিন মনে হয়। বিনোদ মুগ্ধ চোখে খোকাকে দেখছিল। হঠাৎ তা খোকার নজরে পড়ল। কুঁকড়ে গেল সে।

"তোকে একটা কথা বলব, শুনবি ?"

খোকা অবাক হয়ে শুধু তাকিয়ে রইল। ইতস্তত করে বিনোদ বলল, "তোর ঠাকুরদার পর মান-সম্মানের মুখ আর দেখিনি। তুই আবার দেখা, পারবি না ?"

কথাটা বোঝবার জন্য খোকা কিছু সময় নিল। ধীরে ধীরে

ফ্যাকাশে হয়ে এল ওর মুখ। বিনোদ ঝুঁকে ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, "মনের মধ্যে সদাসর্বদা বলবি, বড়ো হবো বড়ো হবো। ফাঁকি দিবিনা, ছোটো কাজ করবিনা, একবার নিচু হলে উঠে দাঁড়ানো ভারি শক্ত কাজ রে।"

ভয়ঙ্কর এক ক্ষুধার্তের মতো সে অপেক্ষা করতে লাগল। খোকা অন্তত একবার মাথাটাও হেলাক বা একছিটে হ্যাঁ বলুক।

সেইসময় ভিতরের ঘরে পীতু নাকি সুরে টেনে টেনে কান্না জুড়ল। বিনোদ বিরক্ত হয়ে ভিতরে গেল। ওর ক্রুদ্ধ মুখভাবে পীতু চুপ করল। সীতা দ্রুত বেরিয়ে গেল। পীতুও বেরোতে যাচ্ছিল, বিনোদ ওর কান ধরল। "কাঁদছিস কেন, দাদা পড়ছেনা ও ঘরে ?"

সেই সময় নীতু বলল, "দিদি চপ খাচ্ছিল। ওকে দিয়েছে তবু দেখনা, আবার চাইছে।"

"পেল কোথায় তোর দিদি ?"

নীতু চুপ করে রইল। সীতা রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে। বিনোদ তাকে দুবার জিজ্ঞাসা করল। সীতা তবু চুপ। এবার কঠিন ভঙ্গিতে বিনোদ এগিয়ে গেল, "পয়সা পেলি কোথায়, কে এনে দিল ?"

"কেউ না।"

হঠাৎ পীতু বলল, "সুশীলদা জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল।"

কিছুক্ষণ কেউই কথা বললনা, চোখের পাতাটুকু পর্যন্ত ফেলল না। তারপর বিনোদের চড়ে সীতা ছিটকে পড়ল কমলার পিঠের উপর। লাথি মারতে যাচ্ছিল, কমলা দুহাতে আগলে বলল, "বিয়ের যুগ্যি মেয়ের গায়ে হাত তুলতে, লজ্জা করে না ?"

বিনোদ থরথর করে কাঁপছে, গলায় কথা আটকে গেছে। কণ্ঠস্বর দুমড়ে মুচড়ে কমলা বলল, "বড়ো বংশের ছেলে যদি বস্তির লোকের মতো আচরণ কেন ?"

দিশেহারা হয়ে বিনোদ চারধারে তাকাল। ছুটে ঘরের মধ্যে গিয়ে খোকাকে বলল, "সুশীলকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে? এ সব কি ব্যাপার?"

চোখ সরু করে খোকা বলল, "কেন, কি করবে?"

"ভেবেছে কি সে? বখামি করার জায়গা পায় নি?"

"সুশীলদা আমায় সাজেশান এনে দেবে কলকাতা থেকে।"

"তাতে কি হয়েছে, তাই বলে—"

বিনোদের কণ্ঠস্বর মৃতের শেষ কম্পনের মতো কেঁপে উঠে থেমে গেল। খোকার সারামুখে ঔদ্ধত্য মাখানো। কঠিন দেখাচ্ছে। দাঁড়িয়েছে গোঁয়ারের মতো। বিনোদ চোখ নামিয়ে নিল। সন্তর্পণে খোকার পাশ কাটিয়ে বাইরের রকে এসে দাঁড়াল। একবার মুখ ফিরিয়ে ঘরের দিকে তাকাল যেন এইমাত্র তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। জামা পরে খোকা হন হন করে ওর পাশ দিয়েই বেরিয়ে গেল। তখন সে মনে মনে বলল, খোকা ফিরে আয়।

তারপর বিনোদ হাঁটতে শুরু করল। গলি ধরে সে ঘুরতে ঘুরতে চৌরাস্তায় পৌঁছল। তখন সিনেমা ভেঙেছে। মানুষের ভীড় আর সাইকেল-রিক্সার ভেঁপুতে বিরক্ত হয়ে কাছের গলিটায় ঢুকতে যাচ্ছে, দেখল চায়ের দোকানে সুশীল আড্ডা দিচ্ছে। সে থমকে দাঁড়াল। তখনই খোকা এসে ওর সামনে জুড়ে বলল, "কেন এসেছ এখানে? আমি জানতুম তুমি আসবে। তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে মান-সম্মানের কথা ভেবে ভেবে।"

বিনোদ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে। আমার ছেলে, আমারই ছেলে খোকা! ওকি ভাবছে আমি পাগল? মাথা নামিয়ে সে ভীড়ের মধ্যে দ্রুত মিশে যাবার জন্য লোকেদের ধাক্কা দিতে শুরু করল।

ফুটবল মাঠের ওধারে রেললাইন। এধারে শিবমন্দির, বেশ্যা-পাড়ার গলি, মিউনিসিপ্যালিটির দীঘি, বি-ডি-ও অফিস, তারপাশে

ললিতের ঘর। রাস্তার ইলেকট্রিক আলো ঘরের দরজায় কোনক্রমে আসে।

খসখস শব্দ হচ্ছে। অন্ধকার ঘর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে ললিতের বুড়ো বাপ বেরিয়ে এল। "কে ?"

"আমি বিনোদ। রথতলার বিনোদ।"

বুড়ো আন্দাজে তাকাল। হাত দিয়ে মাটি থাবড়ে বলল, "বসো। কি জন্যে ?"

"এমনি।"

"অঃ।"

মাথায় টাক। মুখভর্তি দাড়ি। গায়ের চামড়া প্রাচীন পাথরের মতো কর্কশ, কুঞ্চিত। হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

"ছ'দিন হয়ে গেল। একাদশী থেকে আজ। সবাই বলল, একটু আগেই ছ'টার গাড়ির অনেকে ওখান দিয়েই হেঁটে গেছে, তখন কাউকে দেখেনি।"

বিনোদ টের পেল তার শীত করছে। এগিয়ে বুড়োর মুখোমুখি হয়ে বসল। ওর শরীর থেকে বন্য গন্ধ আসছে।

"আমাকে ওরা চলে যেতে বলেছে। নয়তো বার করে দেবে। ললিতকে থাকতে দিয়েছিল, আমাকে কেন দেবে ?"

"কোথায় যাবেন ?"

আঙুল তুলে বুড়ো ফুটবল মাঠের ওপারে রেললাইনের উদ্দেশ্যে দেখাল।

"কেন ?" ফিসফিস করে বিনোদ বলল।

ও এমনভাবে মুখ তুলল যেন বিনোদের কথাটার অর্থ জানতে চায়। তারপর মাথা নাড়তে শুরু করল। ওর ঘন ভ্রূ, দাড়িতে ভরা মুখটা রাস্তার আলোয় বিক্ষত দেখাল।

"জানো, আমি আর কিছু বুঝতে পারিনা, টের পাইনা। গলির একটা মেয়ে কাল ভাত দিল, খেলুম, স্বাদ পেলুমনা। লঙ্কা ঘষে

আচার দিয়ে খেলুম, তবুও।" ছলছল করে উঠল বুড়োর স্বর, "কাল পেচ্ছাপ করে ফেললুম, তাতেই সারারাত শুয়ে রইলুম। বুঝলে, আমার শীত করলনা।"

বুড়ো হাতড়াতে লাগল। বিনোদ ডান হাতটা এগিয়ে দিতেই খপ করে ধরে কাছে টানতে লাগল। বিনোদ ঝুঁকে ওর বুকের কাছে মুখ এগিয়ে আনল।

"ছ'টা পঁয়তাল্লিশের গাড়িতে চলে গেল, আমাকে ফেলে। ও কি আমাকে ঘেন্না করত? ইদানিং আমি আর কথা বলতুমনা।" বুড়োর স্বর রুদ্ধ হয়ে এল।

"আজ কিছু খেয়েছেন?"

কথাটার অর্থ বুঝতে বুড়ো আবার মুখ তুলল।

"ও আমার কথা একদম ভাবলই না।" বুড়োর নীচের ঠোঁট ঝুলে পড়ল। বিনোদের মনে হল, চোখ দিয়ে জল নামছে। ভাল করে দেখার জন্য সে মুখটা বুড়োর মুখের কাছে আনল। মুখ দাড়িতে ভরা।

বিনোদ বন্য গন্ধ পেল। আগাছা আর ঝোপ।

গাছের পাতা ধূসর। খসখস শব্দে তিতির ছুটে গেল। দূর থেকে দূরের দিকে মহিষের গলায় বাঁধা ঘণ্টা বাজতে বাজতে চলে যাচ্ছে। উপরে বৃক্ষহীন মসৃণ ঢালু পাথরে পশ্চিম থেকে রোদ পড়েছে। বাবা বললেন, 'ঝর্ণা কোন দিকে বলোতো?'

মা চিবুক তুলে একটা দিক দেখালেন। বাবা হাসলেন, 'নন্তু, তুই বল্।'

বোকার মত চারধারে তাকালাম। তখন বাবা বললেন, 'আয় আমরা খুঁজে বার করি, পারবি?' আমি মাথা নাড়লাম; বাবা আর মা দুধারে চলে গেলেন। সর্বত্র আলগা পাথর, হাঁটু-সমান ঝোপ। একটু নীচে বড়ো বড়ো গাছ। মনে হল ওই দিকেই ঝর্ণা। পা টিপে নীচের দিকে নেমে এলাম। একটা উঁচু পাথরে উঠে

দাঁড়িয়েছি, দেখি মার হাত ধরে বাবা তাড়াতাড়ি নেমে আসছেন। আমায় দেখে হাত তুললেন। কাছে এসে বললেন, 'নন্থু, এখুনি ফিরতে হবে। এখানে কাল চিতাবাঘ দেখা গিয়েছিল। এক রাখাল বলল।'

ফেরার সময় বলেছিলাম, 'তোমরা ঝর্ণা পেলেনা?' কিন্তু ওরা খুব উদ্বিগ্ন থাকায় জবাব দিলেননা। প্রায় নীচে পৌঁছে গেছি। তখন মনে হল কাছাকাছিই কোথাও ঝর্ণা রয়েছে, শব্দ শুনতে পাচ্ছি। বাবাকে বললাম। তিনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'না, না, বেলা পড়ে আসছে, এখন ঝর্ণার ধারে যায়না। বাঘে জল খেতে আসবে।' মা খুব শক্ত করে আমার হাত চেপে ধরলেন। তখন খুব সুন্দর সূর্যাস্ত হচ্ছিল; অনেক দূরে গিয়ে একবার পিছু ফিরে তাকিয়েছিলাম। পাহাড়টা অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। ওর মধ্যে ঝর্ণা আছে, সেটা আর দেখা হলনা। তবু বিনোদ মুখটা আরো কাছে আনল। আঙুলটা বুড়োর চোখে স্পর্শ করিয়ে আলোর দিকে বাড়িয়ে দিল। চিকচিক করে উঠল আঙুলের ডগাটা।

বুড়ো মুখ তুলে তাকিয়ে। মসৃণ মাথা, ধূসর দাড়ি পাথরখণ্ডের মতো কঠিন চাহনি। হামা দিয়ে ঘরের অন্ধকারে খসখস শব্দ করে চলে গেল।

ফুটবল মাঠ পার হয়ে বিনোদ রেললাইনের ধারে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ চীৎকার করতে করতে খোকা ছুটে এল, "বাবা বাবা, একি পাগলামি হচ্ছে।" সারাক্ষণ ও পিছু নিয়ে রয়েছে। বিনোদ ভাবল, ওকি আমায় এখনো পাগল ভাবছে! কিন্তু ছ'টা পঁয়তাল্লিশের ট্রেন তো আজ আর আসবেনা।

শবাগার

মুকুন্দ খবরকাগজের প্রথম পাতায় চারটি মৃত্যু-সংবাদ দেখল, বাসিমুখেই। দুজন বিদেশী মন্ত্রী, একজন বাঙালী ডাক্তার ও কেরলের জনৈক এম পি। চারজনই করোনারি থ্রম্বসিসে। ওদের বয়স ৭২, ৫৫, ৫৮ ও ৫৬। মুকুন্দর বয়স ৫১, কিন্তু সে ব্যাঙ্কের প্রবীণ কেরানী। থাকে পৈতৃক বাড়িতে, ছোট সংসার, একতলা ভাড়া দেওয়া।

দোতলায় রান্নাঘর ও কলঘরের লাগোয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁত মাজতে মাজতে সে চিন্তিত স্বরে লীলাবতীকে উদ্দেশ্য করে বলল, "থ্রম্বসিসে আজকাল খুব মরছে।"

লীলাবতী চা তৈরিতে ব্যস্ত। বলল, "কে আবার মরল?"

হাঁ-করে ভিতরের পাটিতে বুরুশ ঘষতে ঘষতে মুকুন্দ বলল, "খওরের কাওজে দিয়েছে, চাজ্জন্।"

"থম্বসিস হয়েই তো ছোঠ্‌ঠাকুরঝির শ্বশুর আপিস যাওয়ার সময় বাসের মধ্যে মরে গেল। পাশের লোকটা পর্যন্ত টের পায়নি। কি পাজি রোগরে বাবা!"

এরপর লীলাবতী যা-যা বলবে মুকুন্দর জানা আছে। কি দশাসই চেহারা ছিল, কি দারুণ রগড় করত, কি ভীষণ খাইয়ে ছিল ইত্যাদি। একতলার কলঘরের ছিটকিনি খেলার শব্দ হতেই মুকুন্দ বারান্দার ধারে সরে এল। শুকনো শাড়িটা আলগা করে সদ্যস্নাত দেহে জড়িয়ে শিপ্রা বেরোচ্ছে। হাতে গোছা করে ভিজে কাপড়।

শীতলপাটির মত গায়ের চামড়া, দেহটি নধর। লীলাবতী রান্নাঘর থেকে একটানা কথা বলে যাচ্ছে। মীরা স্কুলে যাবার জন্য আয়নার সামনে। মন্টু তার ঘরে এখনো ঘুমোচ্ছে।

শিপ্রা উঠোনের তারে কাপড় মেলে দিতে দিতে মুকুন্দকে দেখে ভ্রুকুটি করেই হাসল। গোড়ালি, মুখ ও দুটি হাত তোলা। চিবুক এবং বগলের কেশ থেকে জল গড়াচ্ছে। হাসতে গিয়েই ভারসাম্যটা টলে গেল সামান্য। তাইতে ওর বুক ও পাছার যৎসামান্য কম্পনটুকু উপভোগ করতে করতে মুকুন্দ মাজনের ফেনা গিলে, চেটো দিয়ে কষ মুছে নিয়ে হেসে লীলাবতীকে বলল, "এর থেকেও পাজি রোগ ক্যানসার।"

নিচের ভাড়াটে শিপ্রার স্বামী গৌরাঙ্গকে দিন কুড়ি আগে জবাব দিয়ে ক্যানসার হাসপাতাল ছেড়ে দিয়েছে। এখন দিন গুণছে। লীলাবতী গলা নামিয়ে বলল, "যা অবস্থা দেখলুম, মনে হচ্ছে এ মাসের মধ্যেই হয়ে যাবে। বউ আর মেয়ের যে কি দশা হবে এরপর! মন্টুকে তুলে দাওতো, চা হয়ে গেছে।"

মন্টুকে ডাকতে গিয়ে মুকুন্দ দরজার কাছে থমকে গেল। কাত হয়ে খাটে ঘুমোচ্ছে, লুঙ্গিটা হাঁটুর উপরে উঠে রয়েছে। বাইশ বছরের ছেলে, কলেজে পড়ে। ঈষৎ গম্ভীর প্রকৃতির। বাপের সঙ্গে কমই কথা বলে। মুকুন্দ সন্তর্পণে লুঙ্গিটা নামিয়ে মন্টুর কাঁধে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "ওঠ্, চা জুড়িয়ে যাচ্ছে।"

ঘর থেকে বেরিয়ে কলঘরে মুখ ধুতে যাবার সময় মুকুন্দ দেখল, মেয়ের ফ্রকটা তারে মেলবার জন্য শিপ্রা ছুঁড়ে দিল এবং পড়ে গেল উঠোনের মেঝেয়। মুকুন্দর মনে পড়ল, তারটা এত উঁচু করে বেঁধেছিল গৌরাঙ্গই। ও খুব লম্বা। তখন ওর ক্যানসার ধরেনি।

দোতলা থেকে সিঁড়িটা একতলায় এসে ঠেকেছে শিপ্রাদের দরজার পাশেই। ডানদিকে ঘুরে গেছে হাত-পনেরোর একটা গলি সদর দরজা পর্যন্ত, বাঁদিকে উঠোন ও শিপ্রার রান্নাঘর। মুকুন্দ

বাজারের থলি হাতে নীচে নামতেই শিপ্রা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "আজ কিন্তু রেশন তোলার শেষদিন, নইলে হপ্তাটা পচে যাবে।"

"অফিস যাবার সময় দেব।" বলেই মুকুন্দ ওর পাছায় হাত রাখল।

"ধ্যাৎ।" শিপ্রা ফাজিল হেসে ছিটকে সরে গেল।

সদর দরজার গায়েই শিপ্রাদের ঘরের জানলা। মুকুন্দ একবার তাকাল। গৌরাঙ্গ বুকের উপর হাত রেখে স্থিরচোখে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে। বাজার থেকে ফেরার সময়ও সে তাকাল। গৌরাঙ্গ জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে, চোখদুটো কঠিন বরফের মত ঝকঝকে। যেন শীতল-ক্রোধ জমাট বেঁধে রয়েছে। অফিসে যাবার সময় মুকুন্দ শব্দ করে সিঁড়ি দিয়ে নামল। শিপ্রা দাঁড়িয়ে আছে। পিছনে ঘরের দরজাটা ভেজানো। মুকুন্দর হাত থেকে দশটাকার নোটটা নেওয়া মাত্রই শিপ্রাকে সে জড়িয়ে ধরল। চুমু খেতে যাবে, কিন্তু শিপ্রার দৃষ্টি অনুসরণ করে পিছন ফিরে তাকিয়েই তার বুকের মধ্যে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ ঘটল। মনু সদর দরজার কাছে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে। মুকুন্দর শরীরের মধ্যে তখন ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে মাথায় উঠছে, হাড় থেকে মাংস খুলে খুলে পড়ছে।

শিপ্রা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। মনু মাথা নিচু করে মুকুন্দর পাশ দিয়েই উপরে উঠে গেল। সদর দরজার পাশে দাঁড়িয়ে মুকুন্দ অসহায় বোধ করে অবশেষে শিপ্রার ঘরের জানলায় তাকাল। গৌরাঙ্গর চুল ধরে বাচ্চামেয়েটি টানাটানি করছে। গৌরাঙ্গর চোখ থেকে জল গড়িয়ে ঠোঁটের কোল ঘুরে চোয়ালে পৌঁছে টলটলে একটা বিন্দু হয়ে রয়েছে।

বাসে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মুকুন্দর মনে পড়ল, জয়ার শ্বশুর বাসের মধ্যে থ্রম্বসিসে মারা গেছল। তারপর মনে হল, মনু কি আমায় ঘেন্না করবে?

"আজ সকালে আমাদের পাড়ার মধ্যে একটা খুন হয়েছে।" মুকুন্দর পিছনে কে একজন কাকে বলল, "পাইপগান দিয়ে মেরেছে। বছর আঠারো বয়স হবে।"

"রাস্তাতেই?"

"তবে নাতো কোথায়? বাড়ি থেকে বার করে এনে, রাস্তাভর্তি লোকের সামনেই!"

"কেউ কিছু করল না?"

"পাগল! করতে গিয়ে কে প্রাণ খোয়াবে!"

"পুলিস?"

"এসে বডিটা নিয়ে গেল।"

"অ্যারেস্ট করেনিতো কাউকে? যা পেটান পেটাচ্ছে তাতে নাকি চিরজীবনের মত পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে!"

বাসের লোকেরা, এরপর, পেটানোর নানান বীভৎস পদ্ধতির আলোচনা শুরু করল। মুকুন্দ তখন ভাবতে লাগল, আরো পনেরো কুড়ি বছর যদি বাঁচি তাহলে মন্নুকে নিয়েই তো বাঁচতে হবে! কিন্তু কি করে বাঁচব যদি ও ঘেন্না করে?

অফিসের লিফটে পাঁচতলায় ওঠার সময় সে ভাবতে লাগল, মন্নু কি ওর মাকে ব্যাপারটা বলে দেবে? একেবারে ছেলেমানুষ নয়, সিরিয়াস ধরনের। হয়তো লজ্জায় নাও বলতে পারে। এই সময় মুকুন্দ শুনল, তার সামনের লোকটি পাশেরজনকে বলছে —"না ভাই, শরীর খারাপ নয়। ভাগ্নেটা পরশু মার্ডার হয়েছে, এখনো লাশ পাওয়া যাচ্ছেনা। মনটা তাই—" লিফট চারতলায় থামতেই ওরা দুজন বেরিয়ে গেল।

চেয়ারে বসামাত্র পাশের টেবলের অজিত ধর মাথা হেলিয়ে বলল, "মুকুন্দদা আজকের কাগজ দেখেছেন? চার চারটে থ্রম্বসিস ডেথ ফ্রন্ট পেজেই। সবাই অ্যাবাভ ফিফ্‌টি।"

"আমার ফিফটি-ওয়ান।" মুকুন্দ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

টেবলের ফাটল থেকে উঠে আসা ছারপোকাটার দিকে এবং সেটা একটা ফাইলের মধ্যে সেঁধিয়ে যাবার পর আবার বলল, "আমার একান্ন শুরু হয়েছে।"

"এবার সাবধান হোন। স্নেহজাতীয় জিনিস খাওয়া কমান আর লাইট ধরনের কিছু ব্যায়াম করুন।"

অজিত ধরের স্বাস্থ্যটি চমৎকার। বছর পনেরো আগে ওয়েট-লিফটিং-এ স্টেট চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল ফেদারওয়েটে। বিয়ে করেনি। এখন তবলা শিখছে। মুকুন্দ ড্রয়ার থেকে দোয়াত বার করে কলমের ক্যাপ খুলতে খুলতে বলল, "তোমার এসব হবেনা।"

"কি করে জানলেন?"

"যারা হ্যাপি যাদের উদ্বেগ নেই তাদের হয়না। থ্রম্বসিসে কটা মেয়েমানুষ মরেছে?"

"কিন্তু আমি মেয়েমানুষ নই।" অজিত ধর গম্ভীর হয়ে মুখ ফেরাল। মুকুন্দর মনে পড়ল, জয়ার শ্বশুরকে পাঁচদিন পর মর্গে পাওয়া যায়, পচ ধরে বীভৎস দেখাচ্ছিল, মুখে রুমাল চাপা দিয়ে বেরিয়ে এসেই জয়ার ভাসুর বমি করে ফেলে। আইডেন্টিফাই করার মত কোনকিছু সঙ্গে থাকলে ভদ্রলোক তার ছেলেকে বমি করাত না।

এবার মুকুন্দ, কৌতুহলবশতই ভাবল,বাসে আজ যদি থ্রম্বসিসে মারা যেতাম, তাহলে আমার লাশটার কি হত? বাসটা নিশ্চয় থেমে যাবে। কেউ বলবে হাসপাতালে, কেউ বলবে থানায় বাসটাকে নিয়ে চল। তারমধ্যে সেই লোকটা—যে বলেছিল, 'পাগল। করতে গিয়ে কে প্রাণ খোয়াবে'—বলবে "একদমই যখন মরে গেছে তখন আমাদের অফিস লেট করিয়ে লাভ কি, বরং এখানেই নামিয়ে দিন, পাবলিক কিংবা পুলিশ ব্যবস্থা করে দেবে।" শুনে মনে মনে সবাই হাঁফ ছাড়বে, তবে দু-একজন আপত্তি জানিয়ে বলবে রাস্তায় নামিয়ে দেওয়াটা খুবই নিষ্ঠুর দেখাবে, বরং বাসের একটা সীটে বসে থাকুক। সবাই অফিসে নেমে গেলে তারপর থানায়

বা হাসপাতালে পেঁীছে দিলেই হবে। এই কথার পর তর্ক বেধে যাবে। তখন ড্রাইভার বিরক্ত হয়ে বাসটা চালিয়ে দেবে। সবাই ড্রাইভারকে তখন, উল্লুক বলবে।

মুকুন্দর মজা লাগছিল এইরকম ভাবতে। কিন্তু সত্যিই যদি থ্রম্বসিসে মারা যেতুম? এই অজিত ধর কি লিফটে উঠতে উঠতে কাউকে বলবে—না মশাই, শরীব আমার ফিট আছে। বারো বছরের কলীগ মুকুন্দ সেন আজ পাঁচদিন ধরে নিখোঁজ। যা দিনকাল, মার্ডার-টার্ডার হল কিনা কে জানে। লোকটা অবশ্য একদিক থেকে ভালই ছিল, পলিটিক্স করতনা, তবে মদ-টদ খেত শুনেছি।

আড়চোখে মুকুন্দ তাকাল অজিত ধরের দিকে। শরীর দুর্বল হয়ে যাবে বলে বিয়ে করেনি। শরীর গরম হতে পারে বলে ফুটবল খেলা পর্যন্ত দেখেনা। আড়াইটে বাজলেই ড্রয়ার থেকে একটা আপেল বার করে খায়। ওর থ্রম্বসিস হবেনা। ওর ছেলে থাকত যদি, সে বমি করার সুযোগ পাবেনা। পকেট হাতড়ে মুকুন্দ কয়েকটা নোট, খুচরো পয়সা আর এলাচের মোড়ক বার করল। এর কোনটা দিয়েই তাকে আইডেন্টিফাই করা যাবেনা। মোড়কটা জনৈক ভোলানাথ গুঁইয়ের লণ্ড্রি বিল। সেটা কুচিয়ে ফেলে মুকুন্দ নিজের নাম-ঠিকানা ইংরাজীতে একটা কাগজে লিখে, বুকপকেটে রেখে স্বস্তি বোধ করল।

অফিস থেকে বেরিয়ে মুকুন্দ শুনল, উত্তর কলকাতায় ট্রাম পুড়েছে তাই ট্রাম বন্ধ। বাস স্টপে গিয়ে দেখল শিশির নামে লীভ-সেকশ্যনের নতুন ছেলেটি দাঁড়িয়ে। বছর পঁচিশ বয়স, ফার্স্ট ডিভিশ্যনে ফুটবল খেলে। অফিস টিমে খেলবে বলেই চাকরি পেয়েছে। আঁটসাট প্যাণ্ট, নাভির নীচে বেল্ট, উঁচু গোড়ালির ছুঁচলো জুতো আর ছিপছিপে শরীর। অফিসের মেয়েরা যে ওর দিকে তাকায় এটা ও জানে। কিন্তু শিশির

এখন ধুতি-পাঞ্জাবী-চটি পরে দাঁড়িয়ে।

"ব্যাপার কি? এই বেশে তোমায় ঠিক মানাচ্ছেনা ভাই, কেমন যেন বয়স্ক-বয়স্ক লাগছে।"

শিশিরকে মুহূর্তের জন্য অপ্রতিভ দেখাল। একটি সুঠাম মেয়ে শ্যামবাজারের বাসে ওঠার জন্য মরিয়া হয়ে ধাক্কা দিতে দিতে এগোল এবং হ্যাণ্ডেল ধরে পা রাখামাত্র বাস ছেড়ে দিল। পা-দানির একটি যুবক তৎক্ষণাৎ মেয়েটির পিঠে বাহুর বেড় দিল। শিশির বাসটার থেকে চোখ সরিয়ে তিক্তস্বরে বলল, "এখন সবথেকে সেফ বুড়ো হয়ে যাওয়া। আমার পাশের বাড়ির ছেলেটাকে মাসখানেক আগে পুলিস রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে এমন মেরেছে যে হাঁটু দুটো এখনো ভাল করে মুড়তে পারেনা। আমি জানি ছেলেটা কোন গোলমালে নেই। শুধু ডাঁটো বয়সের জন্যই ওর সর্বনাশ হল।"

মুকুন্দ চিন্তিত স্বরে বলল, "আমার ছেলেও গোলমালে থাকেনা, কিন্তু কার সঙ্গে মিশছে তাতো জানিনা।"

শিশির আলতো করে চুলে হাত বুলিয়ে বলল, "আমার ভাই কাল বাড়িতে বোমা এনে লুকিয়ে রেখেছিল। জানেন মুকুন্দদা, আমরা খুব গরীব। খেলার জন্যই এই চাকরি। পঙ্গু হয়ে যাই যদি আমায় রাখবে কেন, এখনো তো কনফার্মড হইনি। এই শরীরটাই আমার সব।"

মুকুন্দকে আর কিছু বলতে না দিয়ে শিশির প্রায় ছুটেই রাস্তা পার হয়ে ভিড়ে মিশে গেল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে মুকুন্দও হাঁটতে শুরু করল। আধঘণ্টা হাঁটার পর তার মনে হল রাস্তা ক্রমশ ফাঁকা দেখাচ্ছে, পথচারী কম, গাড়িগুলি জোরে যাচ্ছে, সি আর পি ভর্তি লরী তিন-চারবার চোখে পড়ল, ক্ষীণ বিস্ফোরণের শব্দও শুনতে পেল। মুকুন্দ স্থির করল, গলি ধরে যাওয়াই ভাল।

মিনিট কয়েক পরেই মুকুন্দর গা ছমছম করতে লাগল। যতোই

এগোয়, সবকিছু ভূতে পাওয়ার মত ঠেকছে। বাড়িগুলোর দরজা-জানলা বন্ধ। চাপা ফিসফাস শোনা যাচ্ছে। অন্ধকার ছাদে আবছা মুখের সারি। দূরে দূরে রাস্তার আলো, মাঝেরটা নেভা। দুধারের শ্যাওলাধরা, পলেস্তারা খসা, বিবর্ণ দেয়ালগুলোর মাঝখানে গর্ত, ঢিপি আর আস্তাকুঁড়ভরা রাস্তাটাকে প্রাচীন সুড়ঙ্গের মত দেখাচ্ছে। নিজের পায়ের শব্দে মুকুন্দর এবার মনে হতে লাগল কেউ পিছু নিয়েছে।

আর একটু এগিয়ে ডানদিকের গলিটা দিয়ে তিন-চার মিনিটের মধ্যে বাড়ি পৌঁছান যায়। তবু মুকুন্দ আর এগোতে সাহস পেলনা। পাশের সরুগলির মধ্যে ঢুকে বড়রাস্তার দিকে কিছুটা এগিয়েই, আচম্‌কা একটা রাইফেল ও দুটো পিস্তলের মুখোমুখি হয়ে দুহাত তুলে সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"কোথায় যাচ্ছেন?" সাদা প্যাণ্ট, হলুদ বুশশার্টপরা লোকটি মুকুন্দর পেটে পিস্তলের নল ঠেকিয়ে রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করল।

"বাড়ি যাচ্ছি স্যার, পাশের বঙ্কু সরকার লেনে থাকি।"

"তাহলে এখানে কেন?"

"অফিস থেকে ফিরছি। গোলমাল দেখে গলি দিয়ে যাচ্ছিলুম।"

"পাড়ায় কারা কারা বোমা ছোঁড়ে?"

"জানিনা স্যার।"

"নাকি বলবেন না?"

"সত্যি আমি জানিনা।"

ইউনিফর্ম পরা ভারিক্কি ধরনের যে লোকটি এতক্ষণ শুধুই মুকুন্দর দিকে তাকিয়েছিল বলল, "নিয়ে গিয়ে দেখাও তো, আইডেন্টিফাই করতে পারে কিনা।"

মুকুন্দর কোমরে পিস্তলের খোঁচা দিয়ে হলুদ বুশশার্ট বলল,

"বাঁয়ে।" সে তখুনি বাঁদিকে ফিরে, দুহাত তুলে, চলতে শুরু করল। রাস্তার যেখানটায় আলো কম এবং দুটো বাড়ির দেয়াল 'দ'-এর মত হয়ে একটা কোণ তৈরি করেছে সেখানে টর্চের আলো ফেলে লোকটি বলল. "ওকে চেনেন?"

মুকুন্দ দেখল একটা দেহ উপুড় হয়ে পড়ে, মুখটা পাশে ফেরান। দু'হাত তোলা অবস্থায় এগিয়ে এসে ঝুঁকে "মনু" বলে অস্ফুটে কাতরে উঠেই বুঝল, দেখতে অনেকটা মনুর মতই। চোখের পাতা খোলা, নীল জামাটা ফালা হয়ে পিঠ উন্মুক্ত, কঠিনভাবে আঙুলগুলো মুঠো করা, ঠোঁট দুটো চেপে রয়েছে, গলায় গভীর ক্ষত। হিঁচড়ে টেনে আনার দাগ প্যাণ্টে। গলা থেকে চোঁয়ান রক্ত থকথকে হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

"এর নাম মনু?"

"না, না, আমার ছেলের নাম মনু। একে অনেকটা তার মত দেখতে। একে আমি একদম চিনিনা স্যার।"

"কখনো একে দেখেননি? ভাল করে দেখে বলুন।"

মুকুন্দ আবার ঝুঁকে পড়ল। গোড়ালি থেকে মাথার প্রান্ত জমাট বাঁধা আগ্নেয়গিরি লাভার একটা ঢেউ খেলানো খণ্ডের মত। এই খণ্ডটাই উত্তপ্তকালে ওর সর্বস্ব ছিল। ওর যন্ত্রণা, বিস্ময় আর দাপট। এখন খোলা চোখ দুটি থেকে শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নির্গত হচ্ছেনা।

মাথা নেড়ে মুকুন্দ বলল, "না, একে কখনো দেখিনি।"

"আচ্ছা চলে যান, এধার-ওধার করবেন না।"

কিছুদূর গিয়ে মুকুন্দ ফিরে তাকাল। বুশশার্ট তাকে লক্ষ করছে। লাশটা এখন অন্ধকারে। মুকুন্দ মনে মনে বলল, আর একটা আনআইডেণ্টিফায়েড ডেড বডি। তারপর বুকপকেটে হাত দিয়ে স্বস্তিবোধ করল। এবার গলিটা, আর একটা গলিকে কেটে সোজা মুকুন্দর পাড়ায় ঢুকে গেছে। মোড়টা আধো অন্ধকার।

দুটি ছেলে হঠাৎ দেয়াল ফুঁড়েই যেন তার সামনে এসে দাঁড়াল। একজনের হাতে ফুট দুয়েক লম্বা ঝকঝকে ইস্পাত।

"কি জিজ্ঞাসা করছিল ?"

মুকুন্দ চিনতে পারল ছেলেটিকে। মনুর বন্ধু ছিল ছোটবেলায়। তখন বাড়িতে আসত, নাম তাজু। না-থেমে গঙ্গা পারাপার করে বলে শুনেছে। এখন পাড়ার মোড়ে চায়ের দোকানেই প্রায়-সময় কাটায়। মনু এখন ওর সংগে আর মেশেনা।

"কিছুই না। শুধু জানতে চাইল লাশটাকে চিনি কিনা।"

"আমাদের কারুর কথা জিজ্ঞেস করল ?"

"না।"

"খবরদার, বলবেন না কিছু।"

ওরা দুজন আবার দেয়ালে সেঁধিয়ে গেল। দুটি স্ত্রীলোককে নিয়ে একটি রিকশা আসছে। একজনকে বিরক্তস্বরে মুকুন্দ বলতে শুনল, "ওম্মা, এইতো যাবার সময় দেখে গেলুম সব ঠাণ্ডা।"

জানলায় শিপ্রা দাঁড়িয়েছিল। মুকুন্দকে দেখেই আলো জ্বেলে দরজা খুলে বলল, "যা ভাবনা হচ্ছিল।"

"আমার জন্য ?"

"তবে নাতো কি ?"

শুনে মুকুন্দর ভাল লাগল প্রথমে। তারপর ভাবল, গৌরাঙ্গর জন্য একদম না ভাবাটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। তাই বলল, "গৌরাঙ্গ আছে কেমন ?"

"একই রকম।" শিপ্রা সাধারণভাবে বলল এবং সহসা গলা নামিয়ে যোগ করল, "মনু কেমন-কেমন করে তাকাচ্ছিল। কাউকে বলে দেবে না তো ? আমার কিন্তু বড্ড ভয় করছে।"

"বড় হয়েছে। মনে হয়না বলবে।"

মুকুন্দ তাড়াতাড়ি উপরে উঠে এলো। ঘরের জানলাগুলো বন্ধ। মীরা ও লীলাবতী সিঁটিয়ে বসে রয়েছে। তাকে দেখে ওরা হাঁফ

ছাড়ল। মীরা বলল, "জান কী কাণ্ড হয়েছে! একটা ছেলের গলা কেটে ফেলে রেখে গেছে খুদিরাম বসাক স্ট্রীটে।" মনু পাশের ঘর থেকে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গম্ভীর স্বরে বলল, "গোলমালের সময় অতুল বোস লেন দিয়ে না ঢুকে শেতলাতলার গলিটা দিয়ে আসাই সেফ্।"

ওর কথা শুনতে শুনতে মুকুন্দর মনে হল, মনু তাহলে এতক্ষণ উদ্বেগের মধ্যে ছিল। ছেলেটা আমার জন্য ভাবে, হয়তো বমি করবেনা।

পরদিন অফিসে বেলা বারোটা নাগাদ মুকুন্দকে একজন টেলি-ফোনে উত্তেজিত স্বরে বলল, "আপনার ছেলে মানবেন্দ্র সেনকে পুলিস রাস্তা থেকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে।"

"কি বলছেন! মনুকে?" মুকুন্দ চিৎকার করে উঠল। "আপনি কি করে জানলেন?"

"আমার ভাইকেও ধরেছে। থানায় গেছলুম। আমাকে নাম আর ফোন নাম্বার দিয়ে আপনার ছেলে জানিয়ে দিতে বলল। এখুনি থানায় গিয়ে চেষ্টা করুন, ছাড়াতে পারেন কিনা।"

ফোন রেখে দেওয়ার শব্দ পেল মুকুন্দ। তারপরই ওর চোখ-কান দিয়ে হু হু করে বাতাস ঢুকতে লাগল। কিছুক্ষণ সে কিছুই দেখতে পেলনা, শুনতে পেলনা। তারপর কাতর স্বরে অজিত ধরকে বলল, "এইমাত্র একজন খবর দিল, ছেলেটাকে পুলিসে ধরেছে রাস্তা থেকে। কিন্তু মনু তো ওসব করেনা, অত্যন্ত ভাল ছেলে। এখন কি করি বলোতো?"

"দেরি করবেননা এখুনি থানায় গিয়ে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করুন। কেস লিখিয়ে ফেললে আর উপায় নেই, চালান করে দেবে। শুনেছি প্রচণ্ড মার দিচ্ছে থানায়।"

"তোমার কেউ চেনাশুনো থানায় আছে? অন্তত যাকে বললে, মারধোরটা করবেনা। মনুর ভীষণ দুর্বল শরীর।"

অজিত ধর মাথা নাড়ল।

"তুমি যাবে আমার সঙ্গে থানায় ?"

"সাড়ে তিনশো লোকের স্যালারি স্টেটমেণ্ট তৈরি করছি, মুকুন্দদা। চারদিন পরই মাইনে। এখনতো ফেলে রেখে—"

মুকুন্দ পাঁচতলা থেকে নামল সিঁড়ি দিয়ে। ট্যাক্সিতে বারত্নয়েক বলল, "একটু জোরে চালান ভাই।" থানায় আট-দশটি ছেলের সঙ্গে মন্নুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ও-সিকে বলল, "আমার ছেলে কোনকিছুর মধ্যে থাকেনা স্যার, ওকে ভুল করে এনেছেন।"

"কোনটি আপনার ছেলে ?" গম্ভীর এবং যেন ক্লান্ত, এমন স্বরে ও-সি বলল।

মুকুন্দ আঙ্গুল তুলে দেখাবার সময় মন্নুর পাশে দাঁড়ান হাফ-প্যাণ্ট পরা ছেলেটিকে কনুই তুলে খুব মন দিয়ে বাহুর থ্যাঁতলান জায়গাটা পরীক্ষা করতে দেখল। মন্নুর দিকে তাকিয়ে ও-সি বলল, "সব বাপ-মা এসেই বলে, তাদের ছেলে নিরপরাধ। যদি নিরপরাধ হয় তাহলে ছাড়া পাবে। আগে আমরা খোঁজ নিয়ে দেখি।"

"কখন ছাড়বেন তাহলে ?"

ও-সি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, মন্নু হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে বলল, "আমি কিছু করিনি স্যার আমি কিছুই জানিনা। বিশ্বাস করুন, আমি শুধু কলেজে যাচ্ছিলুম। খাতা ছাড়া হাতে আর কিছু ছিলনা।"

"চুপ করো।" কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল ও-সি'র পাশে দাঁড়ান ধুতিপরা লোকটি। থতমত হয়ে মন্নু তাকাল মুকুন্দের দিকে। ত্নটি ছেলে পাংশুমুখে নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল। লোকটি ধমকে আবার বলল, "তাজু তোমার পাড়ার ছেলে আর তাকে তুমি চেননা ?"

মুকুন্দ ব্যস্ত হয়ে বলল, "আমার ছেলে ওর সঙ্গে মেশেনা স্যার।"

"বাজে কথা। আমাদের কাছে খবর আছে আপনার ছেলে ওর বন্ধু। তাজুকে কোথায় পাওয়া যাবে, দলে আর কে কে আছে, বলুক, আপনার ছেলেকে ছেড়ে দোব।

মুকুন্দ দেখল মন্নু ঠক ঠক করে কাঁপছে। ওকে এত ভয় পেতে দেখে সেও কাতর হয়ে পড়ল। চোখের জল মন্নুর ঠোঁটের কোল ঘুরে চোয়ালে পৌঁছে টলটল করছে। মুকুন্দের চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল। আবছাভাবে গৌরাঙ্গর মুখটা ফুটে উঠল তার মনে। কাল সকালে এই রকম একটা বিন্দু টলটল করছিল ওর থুতনির কাছে। মেয়েটা তখন চুলধরে টানছিল। কিন্তু মন্নুর তো ক্যানসার হয়নি! মুকুন্দ বিষণ্ণচোখে তাকিয়ে রইল মন্নুর দিকে। শুধু কি শরীরের জন্যই ওর এই কান্না। রাস্তায় কাল বেওয়ারিশ লাশ হয়ে পড়েছিল যে ছেলেটি সেও কি শরীরটাকে ভালবাসতো না!

ও-সি ঘরের একধারে গিয়ে লোকটির সঙ্গে চাপাস্বরে মিনিট দুয়েক কথা বলে ফিরে এল। "আপনি এখন যান, সন্ধ্যের দিকে এসে খোঁজ নেবেন।"

"বিশ্বাস করুন স্যার, আমার ছেলে জীবনে কখনো পলিটিক্স করেনি। আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখুন।" মুকুন্দ ঝুঁকে ও-সি'র হাঁটুতে হাত রাখল। হাতটা সরিয়ে দিতে দিতে ও-সি বলল, "আচ্ছা ঘণ্টা দু-তিন পরেই আসুন, নিরপরাধ হলে নিশ্চয়ই ছেড়ে দেব।"

বেরিয়ে এসে মুকুন্দ ঠিক করতে পারলনা এবার কি করবে। থানার সামনেই একটা বাড়ির রকে বসে পড়ল। এখন অফিসে ফেরা আর এখানে বসে থাকা একই ব্যাপার। লীলাবতীর কান্নাকাটির থেকেও ভাল। বসে থাকতে থাকতে সে অবসন্ন বোধ করতে শুরু করল। দেয়ালে ঠেস দিয়ে তাকিয়ে রইল থানার ফটকে। ক্লান্ত মস্তিষ্কে এলোপাথাড়ি নানান বীভৎস দৃশ্য এখন সে দেখতে পাচ্ছে, অদ্ভুত করুণ শব্দ শুনতে পাচ্ছে। প্রত্যেকটাই স্নায়ুবিদারক।

ছটফট করে মুকুন্দ উঠে পড়ল। দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে বারবার সে শিপ্রার দেহে, নানাবিধ অশ্লীল শব্দে এবং থ্রম্বসিসে নিজেকে আবদ্ধ করে অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করল। কিন্তু সফল হলনা। সবকিছু ছাপিয়ে মন্টুর কান্নাটা তাকে পেয়ে বসছে। ঘণ্টাখানেক পর সে আবার থানার সামনে ফিরে এল এবং রকে বসতে গিয়েই দেখল মন্টু মাথা নিচু করে বেরিয়ে আসছে!

"মন্টু।" তীক্ষ্ণস্বরে মুকুন্দ ডাকল। মন্টু মুখ তুলে তাকাল। মুকুন্দ ছুটে গিয়ে প্রথমেই তন্নতন্ন করে ওর আপাদমস্তক দেখল। তারপর হেসে বলল, "ছেড়ে দিল।"

মাথা নেড়ে মন্টু ফিকে হাসল।

"মারধোর করেনি ?"

"হাতটা মুচড়ে দিয়েছিল ধরার সময়।"

ওর কাঁধে আলতো করে হাত রেখে, হাঁটতে হাঁটতে মুকুন্দ বলল, "অনেকক্ষণ খাসনি, আয় এই দোকানটায়।"

"আমার খিদে নেই।"

"ধরল কেন তোকে ?"

"যে ছেলেগুলোকে থানায় দেখলে, ওরা একটা স্কুলে ভাঙ্গচোর করে বোম ফাটিয়ে এসে আমার পাশ দিয়েই যাচ্ছিল। হঠাৎ প্লেন-ড্রেস পুলিস ঘিরে ধরে মারতে মারতে ওদের সঙ্গে আমাকেও ভ্যানে তুলল।"

"তুই যদি বুড়োমানুষ হতিস তাহলে ধরত না।"

মন্টু জবাব দিলনা। মিনিটখানেক পর মুকুন্দ বলল, "অফিসে ফোন পেয়েই সোজা থানায় এসেছি। বাড়ির কেউ জানেনা, তুই বাড়িতে এ সম্পর্কে কিছু বলিসনা, তাহলেই তোর মা কান্না জুড়ে দেবে।"

ঘাড় ফিরিয়ে মন্টু তাকাল ওর দিকে। চোখদুটো দেখে মুকুন্দর বুকের মধ্যে ক্ষীণ একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর

মধ্যে দিয়ে আবছাভাবে সে গৌরাঙ্গর চোখদুটি দেখতে পেল। ঠিক এই চাহনিতেই সে চিত হয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়েছিল। মুকুন্দর আবার মনে হল, মনুর কেন ক্যানসার হবে!

"তোকে আর কিছু কি জিজ্ঞাসা করেছে?"

চমকে উঠে মনু ভ্রু কুঁচকে অস্বাভাবিক স্বরে বলল, "কি জিজ্ঞাসা করবে?"

"যা জানতে চাইছিল।"

"কিছু জিজ্ঞাসা করেনি।" মনু দাঁড়িয়ে পড়ল। "আমি এখন বাড়ি যাবনা, তুমি কি বাড়ি যাবে?"

"আমি," মুকুন্দ দুধারে তাকিয়ে নিয়ে বলল, "দেখি কোথাও গিয়ে সময় কাটাতে পারি কিনা।"

মনু ভিড়ে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত মুকুন্দ তাকিয়ে রইল। তারপর স্থির করল, ও ক্লাস নাইনে ওঠার পর আর মাতাল হইনি, আজ হব।

রাত প্রায় বারোটায় মুকুন্দ বাড়ি ফিরল। কড়ানাড়ার আগেই সদরদরজা খুলে গেল। অন্ধকারে শিপ্রাকে জড়িয়ে ধরার জন্য হাত বাড়াতেই চাপাস্বরে মনু বলল, "এখন এত রাত করে বাড়ি ফিরোনা।"

মুকুন্দ অন্ধকারের মধ্যে মনুর মুখটা দুই করতলে একবার চেপে ধরে, কথা না বলে দোতলায় উঠে গেল।

সকালে দেরিতে ঘুম ভাঙল তার। চা খেতে খেতে মনুর খোঁজ করল। দুটি ছেলে তাকে ডেকে নিয়ে গেছে শুনেই চায়ের কাপ রেখে তাড়াতাড়ি মুকুন্দ রাস্তায় বেরিয়ে এসে মনুকে দেখতে পেল না। ভয়ে বুক শুকিয়ে এল তার, শিপ্রাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, "কারা ডাকতে এসেছিল?"

"একজনকে দেখেছি, রোগাপানা, ফর্সা, মনুরই বয়সী।"

"হাতে কিছু ছিল?"

"কেন?" ভীতস্বরে শিপ্রা বলল।

ধমকে উঠল মুকুন্দ, "যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দাও।"

"অতশত দেখিনি।"

মুকুন্দ এবার ছুটে বেরোল। পরিচিতদের কাছে খোঁজ নিতে নিতে ট্রাম রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছল। সেখান থেকে দু-তিনটে গলি ঘুরে, গলাকাটা লাশটা যেখানে পড়েছিল সেখানে হাজির হল। এইসময় তার বুকফাটা কান্না পেল। বাড়ি ফিরতেই শিপ্রা রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বলল, "মনু তো অনেকক্ষণ ফিরেছে।"

একটা করে সিঁড়ি টপকে মুকুন্দ দোতলায় এল। মনু তার ঘরে চেয়ারে বসে জানলার বাইরে তাকিয়ে। মুকুন্দ ঘরে ঢুকেই বলল, "কেন ওরা এসেছিল ?"

"কারা !" মনু স্থির চোখে মুকুন্দর চোখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে চাহনিটা তুলে নিয়ে আবার জানলার বাইরে রাখল।

"ওরাকি জেনেছে ?" ব্যগ্র স্বরে মুকুন্দ বলল।

"কি জানবে ?" মনু এবার তীব্রচোখে তাকালো।

মুকুন্দ ফিসফিস করে বলল, "আমি জানি রে আমি জানি।"

"কি জান তুমি ?"

"তোকে ভয় পেতে দেখেছিলুম।"

"কিসের ভয় ?"

"শরীরটার জন্য ভয়।"

"তুমি পাওনা ?" প্রশ্নটি করার জন্যই যেন নিজের উপর অভিমানে মনুর বসার ভঙ্গি কঠিন হয়ে গেল।

"হ্যাঁ পাই।" মুকুন্দ কোমল কণ্ঠে বলল। "আমি তোকে দোষ দিচ্ছিনারে। যদি বলতে না চাস তো বলিসনা। কিন্তু তুই আমার ছেলে, তোর জন্য আমি ভয় পাচ্ছি। সব বাবাই পায়। এটা কাপুরুষতা নয়।"

"তোমার ভয়টা ছেলের প্রাণের জন্য, তাই সেটা কাপুরুষতা নয়।" মনু যান্ত্রিক স্বরে যেন মুখস্ত বলল।

"এভাবে কথাটা নিচ্ছিস কেন।" মুকুন্দ বিব্রত হয়ে বলল। "আমাকে ঘেন্না করার নিশ্চয় অন্য কারণ আছে কিন্তু এজন্য করিসনি।"

"তুমি কি আমায় ঘেন্না করছ, আমি যা করেছি ?"

"মোটেই না। আমি চিরকাল তোকে ভালবাসব।"

"কিন্তু আমি নিজেকে ঘেন্না করছি। থানায় তুমি এমনকরে আমার দিকে তাকালে মনে হল আমি একটা মরামানুষ। কিরকম যেন ভয় করল আমার। নয়তো একটা কথাও বলতামনা, কিছুতেই না।" মনু উঠে দাঁড়াল। টেবলের বইগুলো অযথা ওলট-পালট করতে করতে মোচড়ান স্বরে বলল, "তোমার জন্য, শুধু তোমার জন্য। তুমি আমায় করাপ্ট করেছ।"

মনু একবার শুধু মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। মুকুন্দ তখন প্রত্যাশামত নিশ্চিতরূপে দেখতে পেল, কঠিন বরফের মত ঝকঝকে ওর চোখদুটি। যেন শীতল ক্রোধে জমাট বেঁধে রয়েছে।

মুকুন্দর অফিসে যাবার সময় শিপ্রা দাঁড়িয়েছিল তার ঘরের দরজায়। সে হাসল। মুকুন্দ ভ্রূক্ষেপ করলনা। গলির মোড়ে লাল ডোরাকাটা জামা গায়ে তাজু দাঁড়িয়ে। মুকুন্দ তাকালনা। বাস মাঝপথে বিকল হয়ে থেমে গেল। মুকুন্দ কণ্ডাক্টরের কাছ থেকে ভাড়ার পয়সা ফেরৎ নিলনা। অফিসে অজিত ধরের প্রশ্নের উত্তরে জানাল, খবরটা ভুল। মনুকে ধরেনি। ছুটির পর ট্রাম থেকে নেমে মিনিট তিনেক হেঁটে বাড়ি। নামামাত্র দেখল জটলা করে লোকেরা ভীতচোখে তার পাড়ার দিকে তাকিয়ে বলাবলি করছে। একজন তাকে বলল, "ওদিকে যাবেননা মশাই। এইমাত্র পরপর চারটে গুলির শব্দ হল।" মুকুন্দ সে কথায় কান দিলনা। একটা পুলিসের ভ্যান দাঁড়িয়ে। সেটাকে ঘুরে পার হয়েই সে থমকে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য, তারপর মাথা নামিয়ে গলিতে ঢুকল। তার পাশ দিয়ে দুটো লোক পিস্তল ও রাইফেল পরিবৃত একটা লাল

ডোরাকাটা নিথরদেহ বহন করে নিয়ে গেল। টপটপ করে রক্ত ঝরছে। মুকুন্দ পিছন ফিরে তাকালনা। থমথমে গলির দুপাশের ভীত, বিস্মিত এবং অব্যক্ত চাহনি ও মন্তব্যের মধ্য দিয়ে সে বাড়িতে ঢুকল।

মনু তার ঘরে খাটে উপুড় হয়ে শুয়ে। মুকুন্দ দরজার কাছ থেকে বলল, "তাজুকে পুলিসে নিয়ে গেল। বোধহয় বেঁচে নেই।"

লীলাবতী ও মীরা ছুটে এল বিবরণ শোনার জন্য। মুকুন্দ তখন কলঘরে ঢুকল। হঠাৎ পিছনে পায়ের শব্দে সে ঘাড় ফেরাতেই দেখল মনু ঘর থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে কলঘরের দিকেই আসছে। "কি হল!" বলে মুকুন্দ দ্রুত গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল। মনু তখন হড়হড় করে মুকুন্দর গায়ে বমি করল।

মধ্যরাত্রে মুকুন্দ নীচে নেমে এসে শিপ্রার ঘরের দরজায় টোকা দিল। দরজা খুলে যেতেই সে ঘরে ঢুকে শিপ্রাকে জড়িয়ে ধরল।

"একি, একি! ঘরের মধ্যে নয়। ও রয়েছে যে!"

"থাকুক্‌গে।" শিপ্রাকে মেঝেতে শোয়াতে শোয়াতে মুকুন্দ বলল। "ওতো মরে যাচ্ছেই। তাহলে আবার ভয় কিসের।"

একটি মহাদেশের জন্য

আগামীকাল মধ্যরাত্রের ট্রেনে, এই মফঃস্বল শহর থেকে সরকারী কলেজের ইতিহাসের প্রধান ডঃ প্রফুল্ল ঘোষাল ও তার স্ত্রী করবী চলে যাবেন। ট্রেনে চার ঘণ্টার পথ, বিহার সীমান্তে একটি ক্ষুদ্র কলেজে অধ্যক্ষের পদ নিয়ে যাচ্ছেন। বিকেল থেকে ওরা গোছগাছ করছেন। আসবাব এবং ব্যবহার্য জিনিস নামমাত্র। এখানে এসে যে আসবাব কিনেছিলেন সেগুলি ওরা নিয়ে যাচ্ছেননা। বইয়ের র‍্যাক ও টেবলটি দিয়ে যাবেন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাইমারী বিভাগের হেডমিস্ট্রেস কুমারী গীতা বিশ্বাসকে; চৌকি ও টুল নেবে মুন্সেফ অরুণ সোম; বেঞ্চ ও চেয়ারগুলি চেয়েছে এখানকার বৃহত্তম ওষুধের দোকান ও আড়তের মালিক পরিমল সাঁপুই; উকীল মৃগাঙ্ক বসুমল্লিক মৃদু হেসে মাথা নেড়েছে। দু বছর এখানে থেকে ঘোষাল-দম্পতির সঙ্গে এই কজনেরই শুধু পরিচয়।

বিকেল উতরে গেছে। ঘরে আলো জ্বলছে। প্রফুল্ল র‍্যাক থেকে বইগুলি নামিয়ে মেঝেয় রাখছেন। করবী সেগুলি গুছিয়ে একটি চটের থলিতে ভরছেন। প্রফুল্ল নাতিউচ্চ, বলিষ্ঠদেহী, কাঁচাপাকা অবিন্যস্ত চুলে মাথা ভরা। চশমার কাঁচ পুরু। চোয়াল ভারী ও চওড়া। কথা বলেন ধীর ও মৃদু স্বরে; আচরণে শান্ত ও গম্ভীর। ছাত্ররা কলেজে ওকে দেখে আড়ষ্ট হয়ে সরে যায়।

পরিচিত কয়জনই সন্ধ্যাবেলায় শহরের প্রান্তবর্তী এই একতলা বাড়ীতে গল্প করতে আসে। যেদিন কেউ আসেনা ওরা স্বামী-স্ত্রী

বাইরের বারান্দায় চেয়ারে বসে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাসন্তীর মা রাত্রির আহার ঢাকা দিয়ে রেখে গৃহে ফেরার সময় অস্ফুটে "মা যাচ্ছি" বলে চলে যায়। করবী তখন বলে, "গেটটা বন্ধ করে যেও।" করবীর কণ্ঠস্বর মিষ্টি, হাসিটিও। হাসলে দুই গালে টোল পড়ে। সে ছিপছিপে, দীর্ঘাঙ্গী, প্রফুল্লর সমানই লম্বা। বোধহয় উচ্চতা লুকোবার জন্যই ঈষৎ কুঁজো হয়ে থাকে। চুল কিছু পেকেছে। শ্যামবর্ণ গাত্রত্বক তৈলমসৃণ ও উজ্জ্বল, দীর্ঘ চোখ জোড়ায় কিছুক্ষণ তাকালে দর্শক ক্লান্তি ও বিষাদ অনুভব করে। প্রথম স্বামী মারা যাবার দেড়বছরের মধ্যে ওর দুটি ছেলেই মারা যায়। বড়টি বিমান বাহিনীতে শিক্ষার্থী পাইলট ছিল, পুণার কাছে তার বিমান ভেঙে পড়ে; ছোটটি ডায়মণ্ড হারবারে কলেজ-বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক করতে গিয়ে গঙ্গায় ডুবে যায়। এর ছয়মাস পর করবী তার কলেজের সহপাঠী প্রফুল্ল ঘোষালকে বিয়ে করে এই মফঃস্বল শহরে আসে।

"এভাবে হবে না," ভ্রূকুঁচকে প্রফুল্ল বলল। "বইগুলো বাঁধতে হবে, দড়ি আনি।"

রান্নাঘরের পিছনে কলঘর সংলগ্ন অন্ধকার কুঠুরীটা অব্যবহৃত হঠাৎ দরকারী বিবিধ জিনিসে ভরা। সেখান থেকে প্রফুল্ল চেঁচিয়ে বলল, "টর্চটা আনতো, কিছু দেখতে পাচ্ছিনা।"

টর্চ নিয়ে আসার সময় করবীর মুখে অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে উঠল। রান্নাঘরে বাসন্তীর মা ব্যস্ত। কুঠুরীর সামনে এসে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে করবী বলল, "এই যে।"

প্রফুল্ল পাশ থেকে নিঃসাড়ে দ্রুত ওর গলায় দড়ির ফাঁস পরিয়ে টান করে এঁটে ধরল। করবী ফাঁসটা আলগা করার চেষ্টায় দশ-বারো সেকেণ্ড টানাটানি করে ক্রমশ শিথিল হতে শুরু করল। প্রফুল্ল তখন চাপাস্বরে হেসে উঠে "এটা চৌত্রিশ" বলে ধীরে ধীরে ওকে ছেড়ে দিতেই করবী কাত হয়ে দেয়ালে হেলে পড়ল।

ঠিক এই সময়ই বাইরের বারান্দা থেকে উচ্চ পুরুষকণ্ঠে কে বলল, "ডক্টর ঘোষাল আছেন নাকি?" প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি বৈঠকখানার দিকে যেতে যেতে বলল, "অরুণবাবু নাকি, আসুন আসুন।"

প্রফুল্ল দরজা খুলে দিতেই টর্চ নিভিয়ে অরুণ সোম বলল, "মীরাও সঙ্গে এল দেখা করে যেতে।" বৈঠকখানার ভিতরে এসে বলল "ওরা কেউ আসেনি?" প্রফুল্ল একথার উত্তর না দিয়ে স্মিত হেসে মীরাকে বলল, "আসুন, আপনি তো অনেকদিন পর এলেন। করবী বইগুলো গোছাচ্ছে এখনি আসবে।"

ঘোমটা আর একটু টেনে মীরা স্বামীর দিকে তাকিয়ে তারপর প্রফুল্লকে বলল "রোজই আসব-আসব করি কিন্তু বাচ্চাদের জ্বর-জ্বারিতো নিত্যি লেগেই আছে। এখানকার দুধ-জল কিছুই ওদের সহ্য হচ্ছেনা। ছোটটা কাল থেকে আবার পড়েছে পেটের অসুখে।" মীরার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ এবং ফ্যাঁসফেসে। সরু হাতে সোনার চুড়িগুলি এবং শাঁখাটি ঢলঢল করছে। সিঁথির চওড়া সিঁদুরে ও কপালের টিপে ওর শুভ্র দেহের রক্তাল্পতা ও শীর্ণতা প্রকট। তুলনায় ছত্রিশবছরের সুদর্শন অরুণকে অন্তত দশবছরের ছোট দেখায়। অরুণ প্রতিদিন ভোরে এক মাইল দৌড়ে এসে আধ সের দুধ খায়, রাতে ইংরাজী ডিটেক্টিভ বই পড়ে এবং নিয়মিত গল্প লিখে সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোয় পাঠায়, দু-একটি ছাপাও হয়েছে।

"শুনেছেন তো আজকের ঘটনাটা?" চেয়ারে বসে অরুণ বলল। প্রফুল্ল অবাক চোখে তাকাতেই সে উত্তেজিত হয়ে সিগারেট বার করল। "স্টেশনের গায়েই সারি দিয়ে দরমার তৈরী রিফিউজিদের যে দোকানগুলো রয়েছে তার মধ্যে একটা চায়ের দোকানও আছে। প্রায় দেড় মাস আগে সেই দোকানদারের বৌ থানায় গিয়ে বলে তার স্বামী তিন দিন যাবৎ নিখোঁজ। পুলিশ খোঁজ নিয়ে দেখল ওখানকার একটা যুবতী বিধবাকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। সুতরাং দুই আর দুইয়ে চার ধরে নিয়ে ব্যাপারটা

ওখানেই ধামাচাপা পড়ে। আজ সকালে দোকানের মাটির মেঝে খুঁড়ে দুটো লাশ পাওয়া গেছে। দুটোরই মাথার খুলির পিছন দিকটা চুরমার অর্থাৎ পিছন থেকে ভারী কিছু দিয়ে—"

করবীকে ঢুকতে দেখে অরুণ থেমে গেল। সিগারেটের কাগজ ও তামাক প্রফুল্লর হাতে তুলে দিয়ে করবী হেসে মীরাকে বলল, "বাচ্চারা কেমন আছে? আপনার শরীরও তো ভাল মনে হচ্ছেনা।"

শোনামাত্র খুশিতে নড়েচড়ে বসল মীরা। কিন্তু অরুণের বিরক্ত চোখে চোখ পড়ামাত্র নিরাসক্ত স্বরে বলল, "আমি ভালই আছি। কাল আপনারা চলে যাবেন তাই দেখা করতে এলুম।"

অরুণ ইতিমধ্যে সিগারেট ধরিয়ে ফেলেছে। প্রফুল্ল মাথা নিচু করে সিগারেট বানাতে ব্যস্ত। অরুণ গলা খাঁকারি দিল। করবী বলল, "গল্পটা শেষ না করা পর্যন্ত অরুণবাবু স্বস্তি পাবেন না, বরং শেষ করেই ফেলুন।"

"গল্প নয় মিসেস ঘোষাল, ট্রু ফ্যাক্ট! আমি নিজে গিয়ে দেখে এসেছি। বৌটাকে অ্যারেস্ট করে থানায় যখন ইণ্টারোগেট করা হচ্ছে তখন আমি ছিলাম, এস-ডি-ও সাহেবও ছিলেন। নিজে থেকেই স্বীকার করল খুন করেছে। কী বীভৎস ব্যাপার ভাবুন, দোকানটার পিছনে একটা খুপরিতে থাকত আর খুন করে তারই তলায় মেঝের মাত্র দেড়হাত নীচে দুটো ডেড বডি পুঁতে রেখে দেড়মাস তার উপর শুয়েছে! ভাবতে পাবেন? অথচ এমন কোয়ায়েটলি সব কথা বলে গেল যেন—" অরুণ জুতসই উপমা খোঁজার জন্য মুহূর্তেক অবসর নিতেই মীরা বলল, "পাপ কখনো কি চাপা থাকে!"

প্রফুল্ল বলল, "কার পাপ?"

মীরার বসার ভঙ্গিটা কঠিন হয়ে গেল। মেঝের দিকে তাকিয়ে হাত মুঠো করল এবং কাঁপা গলায় বলল, "কার আবার, স্বামীর পাপ।"

"আর যে খুন করল তার বুঝি পাপ হয়না !"

চোখ তুলে করবীর দিকে একবার তাকিয়ে মীরা একটু ভেবে বলল, "কি জানি।"

তিনজনের কেউ কিছুক্ষণ কথা বললনা। নীরবতা ভাঙার জন্য প্রফুল্ল বলল, "অরুণবাবু কাল সকালেই ভারী মালগুলো স্টেশনে পাঠাব বুকিংয়ের জন্য। আপনার চৌকিটা নিতে কালই কিন্তু লোক পাঠাবেন।"

অরুণ অন্যমনস্কের মত মাথা কাত করল। বাইরে গেট খোলার শব্দ হল। গেট থেকে বারান্দা পর্যন্ত প্রায় পনেরো মিটার ইঁট-বাঁধান পথের উপর দিয়ে জুতোর শব্দ এগিয়ে আসতেই অরুণ বলল, "পরিমলবাবু।"

দশাসই লম্বা মধ্যবয়সী পরিমল সাঁপুই ঘরে ঢুকেই বলল, "উকিলবাবু হেড দিদিমণি, ওরা এখনো আসেনি? একটু আগেই দোকান থেকে যেন দেখলুম দুজনকে রিক্সায় আসতে।"

শুনেই মুখ কালো হয়ে গেল অরুণের। বলল, "আপনি বোধহয় ভুল দেখেছেন।"

"আর যাই ভুল হোক অরুণবাবু চোখের ভুল আমার হবেনা। আগের মাসেও একজোড়া বুনো শুয়োর মেরেছি পঞ্চাশ গজ দূর থেকে। আর দুটো চেনামানুষকে পঞ্চাশ হাত দূর থেকে চিনতে পারবনা?" পরিমল শেষপর্যন্ত বিরক্তি চেপে রাখতে পারলনা।

অরুণ জবাব দিলনা। প্রফুল্ল বলল, "আজ রোমহর্ষক একটা ব্যাপার নাকি শহরে আবিষ্কৃত হয়েছে?"

পরিমল তাচ্ছিল্যসূচক একটা শব্দ করে বলল, "ও রকম আকছারই ঘটে। আমি কিন্তু বেশিক্ষণ বসবনা, দোকানে একজনের আসার কথা। যেজন্য এসেছি বলেনি, একটা বড় প্যাকিং বাক্সে মাল এসেছে, মজবুত খুব। আপনার দরকার লাগে যদি কাল পাঠিয়ে দেব।"

"ভীষণ দরকার, তাহলে দামী বইগুলো আর থলেয় ভরতে হয় না।" করবী উৎসাহভরে বলল।

"তাহলে চা খাওয়ান।" পরিমল হাত বাড়িয়ে অরুণের সিগারেট প্যাকেটটা তুলে নিল।

রিক্সার ভেঁপু বাজল রাস্তা থেকে। অরুণ চেয়ারের হাতলে ভর দিয়ে শরীরটাকে তুলে বাইরে তাকিয়েই আবার বসে পড়ল। পরিমল মুচ্‌কে হাসল। মীরা হাত মুঠো করে দেয়ালে তাকিয়ে রইল।

প্রথমে ঘরে ঢুকল গীতা। ত্রিশের কাছাকাছি বয়স। বাল্যে পোলিওয় ডান পা-টি পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘ চিকিৎসায় সেরে উঠলেও এখন সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটে। এই ঘাটতি অবশ্য দেহের অন্যান্য অংশ মনোরমভাবে পুষিয়ে দিয়েছে। মোটা ভ্রুয়ের নীচে ওর চোখ দুটি সতত চঞ্চল। ঠোঁট দুটি পুরু এবং টসটসে, নাক চাপা, গলায় রক্তাভ জড়ুল। কণ্ঠস্বর ঈষৎ কর্কশ।

গীতার পিছনে পাঞ্জাবি ও ঢোলা পায়জামা পরা মৃগাঙ্ক, রুমাল দিয়ে ঘাড় মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকে বলল, "আজ বড্ড গুমোট।" ধনী বনেদী পরিবারের সন্তান, প্রায় পঞ্চাশবছর বয়সী মৃগাঙ্ক স্থূলকায়, টকটকে গায়ের রঙ, মাথায় অল্প টাক পড়েছে।

"ঠিক সময়েই এসেছে গীতা, চা করতে যাচ্ছিলাম আর অরুণ-বাবুও একটা খুনের গল্প বলছিলেন।"

"কী খুনের?" বলেই গীতা খালি চেয়ারের দিকে এগোল।

"বাঃ শোননি", করবী বিস্মিত স্বরে বলল। "স্টেশনের ধারে এক চায়ের দোকানের মেঝে খুঁড়ে একজোড়া লাশ পাওয়া গেছে?"

"না তো! কি ব্যাপার অরুণবাবু?"

মীরা আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে করবীকে বলল, "এইসব গল্প দুবার শুনতে আমার ভাল লাগেনা। চা করতে যাবেন তো চলুন, আমিও যাব।"

মীরা এবং করবী ঘর ছেড়ে যাবার পরও সবাই ভিতরের

দরজার দিকে তাকিয়ে থাকল। মৃগাঙ্ক বলল, "আমি অবশ্য শুনেছি, কিন্তু এইরকম বীভৎস নোংরা একটা ব্যাপার নিয়ে কোন মহিলার সঙ্গে আলোচনা করতে ইচ্ছে হয়নি।"

গলা খাঁকারি দিয়ে অরুণ তিক্তস্বরে বলল, "এটা যে একটা বীভৎস ভালগার ব্যাপার তা আমি জানি। আমার পয়েন্ট হচ্ছে, একটি মেয়েমানুষ নিজের হাতে খুন করা দুটি লাশের উপর দেড় মাস শান্ত অচঞ্চল হয়ে কাটিয়ে দিল। কিভাবে সে পারল? ওই সময় সে নিজেই চায়ের দোকানটা চালিয়েছে, খদ্দেরদের সঙ্গে মিষ্টি করে কথা বলেছে, ঝগড়া করেছে, স্বামীর খোঁজ পাচ্ছেনা বলে অনেকের কাছে উদ্বেগ পর্যন্ত প্রকাশ করেছে।"

প্রফুল্লর দিকে তাকিয়ে চাপা হেসে মৃগাঙ্ক বলল, "এটাকে সাবজেক্ট করেই অরুণবাবু একটা গল্প লিখে ফেলতে পারবেন।"

প্রফুল্ল বলল„ "মন্দ কি, গল্প হয় না অরুণবাবু?"

অরুণ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। দ্বিধাজড়িত স্বরে সাবধানে বলল, "হতে পারে। তবে এই দেড়মাস যে রকম স্বাভাবিকভাবে কাটিয়েছে তার একটা ব্যাখ্যা, মনের মধ্যে কি ঘটছিল, তার উৎপত্তি কোন উৎস থেকে এসব না বোঝা পর্যন্ত এ ধরনের সাবজেক্ট নিয়ে গল্প লেখা যায়না।"

"আমাদের মধ্যে নরহত্যা কেউই বোধহয় করেনি, তবে প্রাণী হত্যাকারী আছেন একজন।" প্রফুল্ল ঘাড় নেড়ে সহাস্যে সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, "হত্যা করার পর মনের মধ্যে কি কি ব্যাপার ঘটে তিনিই বলতে পারবেন।"

"আমি কিন্তু মশা মাছি ছারপোকা ছাড়া জীবনে আর কিছু হত্যা করিনি।" গীতা নকল গাম্ভীর্য দ্বারা আবহাওয়া লঘু করার চেষ্টা করল।

"কিস্সু ঘটেনা। তখন একটা দারুণ একসাইটমেন্ট হয় বটে, তারপর যে কে সেই।" পরিমল ঝুঁকে অরুণের সিগারেট প্যাকেট

আবার তুলে নিল। "জন্তু জানোয়ার মারা আর মানুষ খুন তো এক জিনিস নয়। মানুষ মারার উত্তেজনাটা অনেকদিন থাকে হয়তো সারা জীবনই, যদি ধরা না পড়ে।"

মৃগাঙ্ক মন্থর স্বরে কাউকে উদ্দেশ্য না করে বলল, "এই উত্তেজনার উৎপত্তি কোন উৎস থেকে ?"

ঘরটা চুপ করে রইল। এই সময় দূর থেকে পরপর তিন-চারটি বোমা ফাটার শব্দ এল। গীতা বলল, "এই এক ব্যাপার শুরু হয়েছে, সন্ধ্যের পর রোজ আওয়াজ করা। কি যে এর মানে বুঝিনা।"

নড়েচড়ে বসল অরুণ। "এস ডি ও সাহেবের কাছে শুনলাম, কাল বড় তালপুরে জমি দখলের আন্দোলন শুরু হচ্ছে। জোত-দাররাও তৈরী আছে। অনেকগুলো লাশ পড়বে মনে হয়।"

"কাল মিসেস বসুমল্লিককে দেখলাম ফুটবল গ্রাউণ্ডের মিটিং-এ বক্তৃতা দিচ্ছেন। মাঠটা কিন্তু ভরে গেছল।" গীতা এই বলে সপ্রশংস চোখে তাকাতে মৃগাঙ্কের মুখে বিরক্তি স্পষ্ট হয়ে উঠল।

অরুণ জানে মৃগাঙ্ক তার স্ত্রীকে নিয়ে আলোচনা একদমই পছন্দ করেনা। তাই বলল "পরশু ওনাকে সিদ্ধেশ্বরীতলায় বক্তৃতা দিতে দেখলাম। দারুণ বলেন, লোকেরা খুব মন দিয়ে শুনছিল। কালকে উনিও নাকি বড় তালপুরে যাবেন।"

"সেকি ! না না বারণ করে দিন মৃগাঙ্কবাবু।" গীতা উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল, "খুনোখুনি হতে পারে। বলা যায়না—"

অরুণ বলল, "আমি এরকম একজন ফিয়ারলেস ওম্যান উইথ স্ট্রং পারসোনালিটি, সত্যি বলছি, কখনো দেখিনি। শুনলাম, বটারহাটে সেদিন জমি দখলের যে মারপিট হল, উনি নাকি তখন কাছাকাছিই ছিলেন। যেমন স্পিরিটেড তেমনি পরিশ্রমও করেন দিনরাত। আচ্ছা ক'বছর জেল খেটেছেন উনি, মৃগাঙ্কবাবু ?"

টর্চের ব্যাটারি দুটো বার করে মৃগাঙ্ক তখন খোলের ভিতরটি গভীর মনোযোগে পরীক্ষায় ব্যস্ত। জবাব দিলনা। অরুণ খুশি

হল এবং বিষন্ন ভঙ্গিতে বলল, "শুনেছি জেল থেকেই নাকি ওনার শরীর ভেঙে যায়।"

পরিমল চুপচাপ সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিল। শেষ টান দিয়ে জানলার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে হঠাৎ বলল, "এটা একটা নেশা, বুঝলেন মুন্সেফবাবু, পলিটিকসে অনেক ভয় আছে। শিকারে যাই কেন, যেহেতু সেখানে ভয় আছে। জানোয়ার আমাকেও মেরে দিতে পারে। ওই ভয় থেকেই তো আসে উত্তেজনা। তখন ঝাঁ ঝাঁ করে শরীরের মধ্যে রক্ত ছোটাছুটি করে, ভারী আরাম হয়, নেশা-নেশা লাগে। তবে কি জানেন, শিকার তো আর রোজ রোজ করা হয় না।"

"তাহলে আপনি কি বলতে চান, মিসেস বসুমল্লিক—" অরুণ যোগ্য একটি শব্দের জন্য প্রফুল্লর দিকে তাকিয়ে দেখল, প্রফুল্ল এক দৃষ্টে জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে। তখন সে গীতার দিকে তাকাল।

"আমার ধারণা, বাচ্চা থাকলে উনি এসব করতেন না।" গীতা গলা নামিয়ে কথাগুলো বলার সময় মৃগাঙ্ক এবং পরিমলকে দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় করতে দেখল।

"ইয়েস, আমারও তাই মনে হয়," অরুণ হাঁফ ছেড়ে বলল। "একটা ভ্যাকুয়াম ওনার মধ্যে নিশ্চয়ই তৈরী হয়েছে যেটাকে ভরাবার জন্য উনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন।"

"অরুণবাবু", গম্ভীর এবং নিস্পৃহ স্বরে মৃগাঙ্ক বলল। "আমরা মোটামুটি ভাবে শিক্ষিত এবং রুচির একটা স্তরেও পৌঁছেছি। আমরা নিশ্চয় কিছু কিছু বিধিনিষেধও মেনে থাকি, যেমন অপরের ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে অযথা ও অনাবশ্যক আলোচনা প্রকাশ্যে না করা।"

অরুণ সকলের মুখের দিকে তাকাল, গীতা বিস্মিত, প্রফুল্ল বিব্রত, পরিমল কৌতূহলী। মুখ নীচু করে অরুণ বলল, "আই অ্যাম সরি, আমি মাপ চাইছি।"

ঘরে অস্বস্তিকর একটা আবহাওয়ার সঞ্চার হয়েছে। কি করে সেটা কাটান যায়, চারজনেই তা নিয়ে মনে মনে ভাবছে। গীতা হঠাৎ বলে উঠল, "এই যাঃ যেজন্য আসা সেটাই বলা হয়নি এতক্ষণ। কাল রাতে আপনারা দুজন কিন্তু আমার ওখানে খাবেন।"

"আবার কেন ঝঞ্ঝাট করা।" প্রফুল্ল আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ক্ষীণ আপত্তি জানাল।

"হোক ঝঞ্ঝাট, একবারই তো। আপনাদের রাতের রান্নার পাট আর তাহলে থাকবেনা।"

অরুণ ব্যস্ত হয়ে বলল, "দিনেও থাকা উচিত নয়। সকালে তাহলে আমার ওখানেই দুটি ঝোল-ভাত খেয়ে নেবেন।"

"না না অরুণবাবু, সকালে আমরা সময় পাবনা। অনেকগুলো কাজ সেরে ফেলার আছে। বইগুলো এখনো বাইরে পড়ে। তাছাড়া ভারি মালপত্তর বিকেলের মধ্যেই স্টেশনে পাঠিয়ে দেব বুক করার জন্য। পরিমলবাবু আপনার প্যাকিং বাক্সটা কাল কখন পাঠাবেন?"

পরিমল কিছু বলার আগে ঘরে ঢুকল করবী এবং মীরা। পিছনে ট্রে হাতে বাসন্তীর মা। ওর হাত থেকে ট্রে-টা নিয়ে টেবলে রাখতে রাখতে করবী বলল, "অরুণবাবুর গল্প বলা হয়ে গেছে তো?"

"গল্প নয় মিসেস ঘোষাল, ট্রু ফ্যাক্ট।" অরুণ ঈষৎ আহত কণ্ঠে বলল, "বরং এটার উপর কল্পনার রঙ দিয়ে একটা গল্প লেখা হতে পারে। আপনি ভাবতে পারেন, একজন স্ত্রীলোক তার স্বামী আর একজন স্ত্রীলোকের মৃতদেহের দেড়হাত উপরে বিছানা পেতে দেড়মাস ধরে শুয়েছে! কি করে পারল? ইয়েস, মাত্র দেড়হাত!"

অরুণ থামামাত্র মীরা চাপা কণ্ঠে বলল, "এইসব খুনোখুনির গল্প কি করে যে আপনারা শোনেন। কেমন গা শিরশির করে শুনলে।"

মীরার কথাগুলো যেন শুনতে পায়নি এমনভাবে অরুণ বলে

চলল, "আমি নিজে সেই স্ত্রীলোকটিকে থানায় আজ দেখেছি। অতি স্বাভাবিক মনে হল। একদম উত্তেজনা নেই, ভয়ও নেই। ঘোমটা দিয়ে বসে, যা জিজ্ঞাসা করছে উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। একদম নির্লিপ্ত। অথচ দেড়মাস ধরে অপরাধটা লুকিয়ে রেখেছিল, অ্যাকসিডেণ্টালি ধরা না পড়লে তো জানাই যেতোনা।"

"কি করে খুনটা করল?" গীতার কৌতূহলে কিঞ্চিৎ উত্তেজনাও প্রকাশ পেল।

"আহ্।" মীরা চায়ের কাপ নেবার জন্য করবীর দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, "আবার এইসব গল্প।"

গীতা ঘাড় ফিরিয়ে মীরার দিকে তাকাল। অরুণ রাগে মুখ লাল করে, অনাবশ্যক গলা চড়িয়ে বলল, "পিছন থেকে মাথায় কয়লাভাঙার লোহা দিয়ে মেরেছিল।"

"থাকগে এ সব আলোচনা।" মৃগাঙ্ক হেসে বলল। "মিসেস সোমের বোধহয় ভাল লাগছেনা।"

"সারারাত ধরে গর্তটা খোঁড়ে একটা শাবল দিয়ে।"

"আমি এখন চলি। দোকানে একজনের আসার কথা। বাক্সটা কাল পাঠিয়ে দেব" পরিমল খালি চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে ব্যস্ত হয়ে চলে গেল।

"ছোট গর্ত, ওরই মধ্যে দুমড়ে মুচড়ে বডি দুটোকে কোনরকমে ভরে, মাটি চাপা দিয়ে বিছানাটা পেতে ঢেকে রাখে।"

"ভাল কথা", প্রফুল্ল তাকাল করবীর দিকে। "গীতা কাল আমাদের নেমন্তন্ন করেছে রাত্রে।"

"ওমা, আমিও তো করবীদিকে রান্নাঘরে বললুম আমাদের ওখানে খাওয়ার জন্য, কাল রাতেই।" মীরা উত্তেজিত হয়ে প্রফুল্লর দিকে তাকাল।

অরুণ দাঁতচাপা স্বরে বলল, "মিস বিশ্বাস আগে বলেছেন এবং ডঃ ঘোষাল অ্যাকসেপ্টও করেছেন।"

"তোমাকে ওর হয়ে ওকালতি করতে হবেনা।" মীরা ক্ষিপ্তের চাহনিতে স্বামীকে বিদ্ধ করে রাখল কিছুক্ষণ। এই পরিস্থিতি থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করার জন্য গীতা ঝুঁকে মৃগাঙ্ককে বলল, "আপনার তো বন্দুক আছে, শিকার-টিকার করেন না ?"

"মাঝে-মাঝে বেরোই, তাও পাখিটাখি! আসলে আমি খুব ভীতু লোক তো।" মৃগাঙ্ক এমনভাবে হেসে উঠল যেটা এখন বিদ্রুপের মত ধ্বনিত হল। প্রফুল্ল আর করবী অসহায়ভাবে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে লক্ষ করে অরুণ গোঁয়ারের মত বলল, "না, মিস বিশ্বাসের নেমন্তন্নই ওরা নেবেন, নেওয়া উচিতও।"

"কেন, আমার নেমন্তন্ন কি অপরাধ করল ? আমি কি রাঁধতে জানিনা ওর মত, না লোকের সঙ্গে কথা বলতে কি মিশতে পারিনা ?" বলতে বলতে মীরার ঠোঁটের তুই কোণে থুথু জমে উঠল।

গীতা কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। প্রফুল্ল জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতে, কঠিন গলায় গীতা বলল, "সামান্য ব্যাপারটা নিয়ে একটু বেশিই ছেলেমানুষী হচ্ছে যেন। আমি বরং আমার নেমন্তন্ন উইথড্র করছি।"

অরুণ ব্যস্ত হয়ে বলল, "সে কি, তা কেন হবে!"

"আমার স্কুলের কিছু কাজ রয়ে গেছে, আজ চলি।" গীতা উঠে দাঁড়াল। সাধারণভাবে হেসেই পরমুহূর্তে গম্ভীর হয়ে সে তার পঙ্গু ডান পা টানতে টানতে বেরিয়ে গেল। ওর পায়ের শব্দ গেটের কাছে পৌঁছবার আগেই মীরা তুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে বলে উঠল, "তুমি চাও আমার অপমান, আমি বুঝতে পারি, সব বুঝতে পারি।"

"চুপ করো।" কর্কশ স্বরে অরুণ ধমকে উঠল। হিংস্র দেখাচ্ছে ওকে। মীরা ভয়ে কুঁকড়ে গেল। "বাড়ি চলো।" অরুণ উঠে দাঁড়িয়ে কারুর দিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মীরা ভীত চোখে ঘরের তিনটি লোকের উপর দিয়ে চাহনি বুলিয়ে দ্রুত স্বামীর অনুসরণ করল।

প্রত্যাশিত অপ্রতিভতা কাটিয়ে মৃগাঙ্কই প্রথম কথা বলল। "মিসেস সোম অরুণবাবুকে খুব ভয় করেন।" তারপর হেসে বলল, "অর্থাৎ পরিমল সাঁপুইয়ের যুক্তি অনুযায়ী নেশার ঘোরে আছেন।"

প্রফুল্ল তামাক দিয়ে কাগজ পাকাতে পাকাতে মাথা নিচু করে বলল, "এটা একটা গতানুগতিক ভয়। নেশা হবার মত উত্তেজনা এতে নেই। নেশা হয় সেই ধরনের ভয়ে যা দিয়ে অনুভব করা যায় জীবনকে। আপনার কি মনে হয় ?" প্রফুল্ল মুখ তুলে শান্ত চোখে মৃগাঙ্কের বদলে করবীর দিকে তাকাল। চেয়ারে বসে করবী। হাতদুটি কোলের উপর দুর্বলভাবে রেখে ক্লান্ত চোখে প্রফুল্লর দিকে তাকিয়ে।

"মানুষের শ্রেষ্ঠ ভয় মৃত্যু-ভয়। সেটা সামনে এসে দাঁড়ালে তখনই শ্রেষ্ঠ জীবনযাপন সম্ভব।" মৃগাঙ্ক নিচু স্বরে কথাগুলো বলে থামল এবং কয়েক মুহূর্ত পরই দ্রুত যোগ করল, "কিন্তু ভয়েরও রকমফের আছে।"

"কি রকম ?" পুরু লেন্সের ওধারে চকচক করে উঠল প্রফুল্লর চোখ দুটি। মৃগাঙ্ক চুপ করে রইল।

"আপনি কখনো ভয়ের মুখোমুখি হয়েছেন ?' প্রফুল্ল আবার বলল।

অস্পষ্ট স্বরে মৃগাঙ্ক বলল, "আমার সন্তান নেই, হবার সম্ভাবনাও নেই।"

করবীর ভ্রূ কুঞ্চিত হল মৃগাঙ্কের কথায়। প্রফুল্ল দেশলাই জ্বালতে একটু দেরী করল। প্রথম ধোঁয়া ছেড়ে সে অনেকক্ষণ ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "সেই স্ত্রীলোকটি দেড়মাসের প্রতিটি মুহূর্তে জীবনের স্বাদ পেয়েছে। আমার মনে হয়না অরুণবাবুর পক্ষে গল্প লেখা সম্ভব।"

"মৃগাঙ্কবাবু, আপনি তো আবার বিয়ে করতে পারেন।" করবী ধীর সহানুভূতিসূচক স্বরে বলল।

"না।" মৃগাঙ্ক মাথা নেড়ে হাসল।

করবী বলল, "আপনি কি ভয়টাকে জীইয়ে রাখতে চান। কিন্তু এটা তো মোটেই ভয় নয়। মৃত্যুর মত এ ভয় অমোঘ নয়। ইচ্ছে করলেই আপনি এটা কাটিয়ে উঠতে পারেন।"

মৃগাঙ্ক শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। বাসন্তীর মা দরজার বাইরে থেকে ফিসফিস করে কি বলতেই করবী বলল, "কাল একটু সকাল-সকাল এসো ” মৃগ.ঙ্ক চেয়ারে সিধে হয়ে টেবল থেকে টর্চটা নিয়ে কব্জী তুলে ঘড়ি দেখল।

"মৃগাঙ্কবাবু বোধ হয় মানবিকতার শিকার হয়েছেন।" প্রফুল্ল তার ভারী গলায় লঘু সুরে হেসে উঠল। "কিন্তু আপনি কি অনুভব করেন না, এবার মানবিক বোধগুলোকে তাড়া করে হটাতে হটাতে, তার ডায়মেনশ্যানকে বাড়িয়ে এমন কিছু জিনিস এর অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যাতে মনে হবে আমার মধ্যে গাঢ়-উষ্ণ একটা জীবন সব সময় নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে? এক ধরনের ফিজিকাল ভয়ের মধ্যে আমার মনে হয়, সব সময় বাস করা উচিত, সেটা পরমাণু বোমাই হোক আর কয়লাভাঙার হাতুড়িই হোক। বেঁচে থাকার এটাই শেষ অবলম্বন।"

মৃগাঙ্ক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনার কথাগুলো আমি ভেবে দেখব।"

রাস্তায় বেরিয়ে মৃগাঙ্ক টর্চ জ্বালার আগে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর মিনিট পাচেক হেঁটে খালের অন্ধকার নির্জন বাঁধে পৌছে অস্থিরভাবে পায়চারী করতে করতে হঠাৎ আকাশের দিকে মুখ তুলে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। কিছুক্ষণ পর বাঁধ থেকে নেমে সে রওনা হল পরিমলের দোকানের উদ্দেশে।

রাস্তার টিমটিমে ইলেকট্রিক আলোয় মৃগাঙ্ক দেখতে পায়নি, কাছাকাছি হতেই সে অবাক হয়ে বলল "এ'ক, বাড়ি যাননি?"

অরুণের হাঁটার ভঙ্গিতে মানসিক বিপর্যয়ের বিধ্বস্ততা স্পষ্ট।

কণ্ঠস্বরে আরো স্পষ্ট। "মিস বিশ্বাসের কাছে অ্যাপোলজি চাইতে যাব ভাবছি, মীরার ব্যবহারের জন্য।"

"ওহ্।"

"কিন্তু চাওয়াটা উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছিনা। আচ্ছা আপনি এখন কোথায় যাবেন। বাড়ি?"

"পরিমলবাবুর দোকানে যাব।" মৃগাঙ্ক হাসল। এখন সেখানে যাওয়ার অর্থ অরুণ জানে। দোকানের পিছন দিকে একটা খুপরি আছে। রাত্রে সেখানে বসে পরিমল মদ খায়। তখন কেউ কেউ যায় সেখানে।

"চলুন আমিও যাব।"

মৃগাঙ্ক ইতঃস্তত করায়, অরুণ অধৈর্য হয়ে বলল, "এখন বাড়ি ফিরতে পারব না। আমার মাথার মধ্যে এখনও আগুন জ্বলছে। আপনি অনেক ভাগ্যবান যে আমার মত স্ত্রী পাননি।"

দোকানের পিছনের দরজা দিয়ে ওরা খুপরিতে ঢুকল। পরিমলের মুখোমুখি বসে গোলগাল বেঁটে একটি লোক। বেশবাসে সম্পন্নতার পরিচয়, মুখে উদ্বেগ। ওদের দুজনকে দেখেই সে টেবল থেকে হাতটা নামিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে পরিমলের দিকে তাকাল। পরিমল অস্বস্তিভরে এধার ওধার তাকিয়ে তারপর স্ফূর্তিবাজের মত হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "আরে আসুন আসুন।"

টেবলের উপর অর্ধ নিঃশেষিত রামের একটি বড় বোতল ও দুটি সদ্য সমাপ্ত গ্লাস। টেবলের নীচে কয়েকটি সোডার বোতল, দেয়ালের ধারে পাঁচ-ছটি প্যাকিং বাক্স। ওরা দুজন তার উপর বসল। পরিমল উঠে তাক থেকে দুটি গ্লাস এনে মদ ঢালতে ঢালতে লোকটিকে বলল, "মধু সোডা খোল্" তারপর অরুণের দিকে তাকিয়ে বলল, "কি ব্যাপার?"

অরুণ শুধু হাসল। মৃগাঙ্ক বলল, "ওরটা একটু কম করে দিও পরিমল, প্রথম দিনেই যেন গোলমাল করে না বসেন।"

পরিমল ভ্রূ কুঁচকে কিছু বলতে যাচ্ছে, তার আগেই অরুণ ব্যস্ত হয়ে বলল, "কলেজ পড়ার সময় কয়েকবার খেয়েছি, কোন গোলমাল হয়নি।"

"বিয়ের পর নিশ্চয় খাননি?" মৃগাঙ্ক গ্লাসটা পরিমলের হাত থেকে নেবার সময় মিটমিটিয়ে হাসল, অরুণ জবাব দিলনা। হাত বাড়িয়ে সে টেবল থেকে গ্লাস তুলে নিয়ে দুই চুমুকে শেষ করে ফ্যাল ফ্যাল চোখে সকলের দিকে তাকাল।

পরিমল বিরক্ত হয়ে বলল, "কি ব্যাপার?"

"মিস বিশ্বাসের কাছে ক্ষমা চাইবেন বলে রাস্তায় এতক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।" গ্লাসে ছোট্ট চুমুক দিয়ে মৃগাঙ্ক বলল।

পরিমল "অঁ্যা" বলে অরুণের গ্লাসে আবার মদ ঢেলে দিল! ওরা কথা না বলে খেয়ে চলল। এক সময় পরিমল বলল, "এ আমার বাল্যবন্ধু মধুসূদন দাস।"

লোকটি কাঁচুমাচু হয়ে বুকে দুই মুঠো ঠেকিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল।

"বোস্।" পরিমল তর্জনী নাড়িয়ে নির্দেশ জানাল। টসটসে মুখ নিয়ে অরুণ তাকাল মধুসূদনের দিকে। তারপর পরিমলকে বলল, "ইনি বড় তালপুরের জোতদার, তাই না?"

মৃগাঙ্কর গ্লাস ধরা মুঠোটা হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল, পরিমল অনেকক্ষণ সময় নিয়ে গ্লাসে চুমুক দিল, মধুসূদন বিভ্রান্ত চোখে অরুণের দিকে তাকিয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রাখল টেবলে।

"আপনি কাল এস ডি ও সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আপনার বন্দুক আছে কিন্তু আরো চাই। আপনি গুলি চালিয়ে মানুষ মারলে রেহাই পাবেন। আপনাকে এক হাজার লোক ঘেরাও করে কুপিয়ে কুপিয়ে মারলে তারাও রেহাই পাবে। সবাই রেহাই পাবে, শুধু আমি ছাড়া।" পাঠশালার পড়ুয়াদের মত দুলে দুলে অরুণ বলে গেল। মৃগাঙ্ক ও পরিমল তখন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে।

আমার বন্দুকটা নিতে এসেছে, আমাকেও।" পরিমল মৃদু-স্বরে বলল। "কিন্তু স্প্রিংটা সারাতে, দিন পাঁচেক আগে কলকাতায় পাঠিয়েছি। ও বলছিল কোথাও থেকে বন্দুক যোগাড় করে দিতে।"

অরুণ বলল, "উকিলবাবুর তো আছে।"

মৃগাঙ্ক অনেকক্ষণ সময় নিয়ে গ্লাসে চুমুক দিল। পরিমলের গ্লাস ধরা মুঠোটা শক্ত হয়ে গেল। মধুসূদন বিভ্রান্ত চোখে অরুণের দিকে তাকিয়ে গ্লাসটা টেবলে নামিয়ে রাখল।

"তোর বউকে কাল যেতে বারণ করিস। এখানে কাল অনেক কিছু ঘটতে পারে।" পরিমল স্কুলজীবনের পর প্রকাশ্যে এই প্রথম মৃগাঙ্ককে 'তুই' বলল।

অরুণ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে টলে পড়ে যেতে যেতে টেবলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। "সাবস্টিটিউট চলবে? উকিলবাবুর বউয়ের বদলে আমার বউ যদি ফিলডিং দেয়, আপত্তি আছে?"

অরুণকে রূঢ়ভাবে টেনে তুলে পরিমল বসিয়ে দিল প্যাকিং বাক্সের উপর। মৃগাঙ্ক ধীর অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলল, "বন্দুকটা কি এখুনি চাই?"

মধুসূদন অস্বস্তিতে নড়েচড়ে, গলা খাঁকারি দিয়ে পরিমলের দিকে তাকাল। অরুণ হাঁটুগেড়ে বসে মৃগাঙ্কের পা জড়িয়ে ধরল। "আমার কিছু নেশা হয়নি মৃগাঙ্কবাবু, আমি বলছি সাবস্টিটিউট নেওয়ার অধিকার আছে। মীরা ক্যাচ-ট্যাচ ফেলবে না···জাস্ট ওয়ান বুলেট···আমি দাম দেব—"

পরিমল ওকে টেনে তুলে বলল, "এবার বাড়ি যান। আপনার নেশা হয়েছে।" তারপর অরুণকে ঠেলতে ঠেলতে দরজার বাইরে এনে বলল, "হেঁটে যেতে পারবেন তো?"

"আমাকে আপনারা কি ভাবেন? য়্যা, একটা কাওয়ার্ড? আমি পারি, গীতা বিশ্বাসের সঙ্গে যা খুশি করতে পারি, কাউকে পরোয়া করিনা। দেখবেন? পারি কিনা দেখবেন?"

অরুণ ঘুরে তাকিয়ে দেখল পরিমল নেই এবং দরজাটা বন্ধ। ঘাড় কাত করে সে কিছুক্ষণ একটানা ঝিঁঝির ডাক শুনল। চারদিকের অন্ধকারে চোখ বুলিয়ে, "কাওয়ার্ডস, অল আর কাওয়ার্ডস।" বলে ধমকে উঠে, কুচকাওয়াজের কায়দায় বাড়ির রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল। ওকে দেখে হতভম্ব মীরা যখন কি করবে ভেবে পাচ্ছেনা তখন কাঁধ থেকে কাল্পনিক রাইফেলটি নামিয়ে, হাঁটু ভেঙে বসে, কাঁধে বাঁট রেখে, একচোখ বুঁজে অনেকক্ষণ তাক্ করে অরুণ চীৎকার করে উঠল, "ডুম্ম্।"

* * *

প্রফুল্ল আর করবী তখন বারান্দায় পাশাপাশি চেয়ারে বসে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে। বাড়ির সব আলো নেভানো। এক সময় প্রফুল্ল আলতো স্পর্শ করল করবীর বাহু। করবী ঘাড় ফেরাল।

"আর ভাল লাগেনা।"

প্রফুল্ল বলল, "তোমার সাক্সেস চব্বিশ, আমার চৌত্রিশ। তুমি কিন্তু একসময় এগিয়েছিলে।"

"সংখ্যা দিয়ে কি হবে। জানিতো এটা সত্যি নয় শুধুই খেলামাত্র। সারা জীবনই এ ভাবে খেলা যায়না।"

প্রফুল্ল হাত সরিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আমার যেন মনে হচ্ছে ভ্রমণ করার মত আর কোন মহাদেশ আমাদের জন্য অনাবিষ্কৃত নেই।"

ক্লান্ত স্বরে করবী বলল, "কিন্তু আমাদের বেরোতেই হবে নইলে বাঁচা যাবেনা। আমি ব্যবধান বাড়াতে চাই অতীতের সঙ্গে। নেকড়ের মত ওরা খালি তাড়া করে, ধরতে পারলে ছিঁড়ে খেয়ে নেবে।"

* * *

এই সময় মৃগাঙ্ক তার শোবার ঘরে দাঁড়িয়ে বন্দুকটা তুলে দেওয়ালে টাঙান নিজের ছবিটাকে তাক করছিল। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে আসার পায়ের শব্দ পেয়েই আলো নিভিয়ে সন্তর্পণে দরজার পাশে দাঁড়াল। বারান্দার অপর প্রান্তের ঘরটি ক্ষণপ্রভার। মৃগাঙ্ক আজ সারাদিন ওকে দেখেনি।

শীর্ণা বালিকার মত দেহ, হাত দুটি দড়ির মত ঝুলছে, মাথাটি এক পাশে হেলান, মৃগাঙ্কের সামনে দিয়েই নিঃশব্দে চলে গেল নিজের ঘরে। বন্দুকটি বিছানার উপর রেখে জানলার ধারের ইজি চেয়ারটাতে দেহ এলিয়ে দিল মৃগাঙ্ক। ধীরে ধীরে চিন্তার মধ্যে সে ডুবে গিয়েছিল, হঠাৎ তার মনে হল ঘরে কে ঢুকেছে।

তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থেকে ক্ষণপ্রভার অবয়বটি চিনতে পারল। বন্দুকের বাক্স আলমারির নীচেই থাকে। মৃগাঙ্ক দেখল, ও নীচু হয়ে বাক্সটি টেনে বার করল। হাতে তুলেই বোধহয় লঘু ভারের জন্য বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইল। তখন চাপাস্বরে মৃগাঙ্ক বলল, "আমি বার করে সরিয়ে রেখেছি। ওটা মধুসূদন দাসের লোক একটু পরে এসে নিয়ে যাবে।"

"কেন? তাতে আমাদের আন্দোলনের ক্ষতি হবে।"

"আমার কিছু আসে যায় না।"

ক্ষণপ্রভা বাক্সটা নামিয়ে রেখে মৃগাঙ্কের দিকে এগিয়ে এল। "বন্দুকটা আমাদের দরকার। এখন তর্কাতর্কি করার সময় আমার নেই, কোথায় রেখেছ?"

"কি লাভ এইসবের দ্বারা তুমি পাবে? কাল তুমি মারা যেতে পার।"

"হ্যাঁ", ক্ষণপ্রভার ঝকঝকে দাঁত অন্ধকারেও মৃগাঙ্ক দেখতে পেল। "মরার সম্ভাবনা কাল অনেকেরই আছে। তবে একটা শর্তে আমি যাওয়া বন্ধ করতে পারি।"

"কি শর্ত?" মৃগাঙ্ক উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল।

"সকলকে জানিয়ে দেব যে আমি বন্ধ্যা নই।"

"না না।" মৃগাঙ্ক কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে উঠল, "তা যদি করো আমি নিজে তোমায় গুলি করে মারব।"

"কি লাভ তার দ্বারা তুমি পাবে?"

মৃগাঙ্ক অবসন্নের মত বসে পড়ল। মাথা নাড়তে নাড়তে কাতর স্বরে বলল, "বোঝাতে পারবনা তা, বোঝান যায়না। পুরুষ হলে বুঝতে পারতে।"

"আর তোমাকে পুরুষ করে রাখতে আমাকে সাজতে হয়েছে বন্ধ্যা।" ক্ষণপ্রভার স্বর ক্রমশ হিংস্র হয়ে উঠল। "কোথায় রেখেছ?"

মৃগাঙ্ক অস্ফুটে বলল "খাটের ওপর।"

*　　*　　*

পরদিন সকালে মীরাকে হাসপাতালে পাঠাতে হল। খুব ভোরে ঘুম ভেঙে অরুণ কলঘরে গিয়ে অর্ধ-দগ্ধ অচেতন দেহটি দেখতে পায়। ডাক্তার জানিয়েছে বাঁচবে কিনা কাল বলা যাবে।

দুপুরে ক্ষণপ্রভা ফিরে আসে পুলিশের সঙ্গে। বড় তালপুর যাবার পথেই সে গ্রেফতার হয়েছে। মৃগাঙ্ক জামিনে ছাড়িয়ে আনতে গিয়েছিল, ক্ষণপ্রভা রাজি হয়নি।

রাত্রে গীতার বাড়িতে আহারের পর প্রফুল্ল বলল, "ভেবেছিলাম তোমার এখানেই গল্প করে বাকি সময়টা কাটিয়ে দুজনে স্টেশনে রওনা হব। মালপত্র তো সবই পাঠান হয়ে গেছে।"

গীতা বলল, "তাহলে থেকে যান। ট্রেন তো মাঝরাতে, আমার কিচ্ছু অসুবিধা হবেনা।"

কবরী মাথা নীচু করে তালুতে মৌরী বাছতে বাছতে বলল, "পরিমলবাবু প্যাকিং কেসটা এমন সময়ে পাঠালেন যে বইগুলো ভরে পেরেক এঁটে সেটা অন্য জিনিসগুলোর সঙ্গে আর স্টেশনে

পাঠান গেলনা। ওটার জন্যই আমাদের যেতে হবে। রিকশা বলা আছে, পৌনে বারোটায় তুলে নিয়ে যাবে।"

"তাহলে এখন বাড়ি ফিরে আপনাদের তো অপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই করার নেই! চলুন সঙ্গে যাই খানিকক্ষণ গল্প করে আসা যাবে।" গীতা টেবল থেকে টর্চটা নিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঝিকে বলল, "বেরোচ্ছি গো। ফিরতে দেরী হলে তুমি আর জেগে বসে থেকোনা।"

ওরা তিনজন প্রধানত মীরা ও অরুণের কথা বলাবলি করতে করতে পৌঁছে গেল। গেট বন্ধ, বাড়িটা অন্ধকার। তালা খুলে ওরা বসার ঘরে ঢুকল। ঘরের আলো জ্বলতেই গীতা কাঠের বাক্সটা দেখে বলল, "বেশ বড় তো একটা মানুষ প্রায় ধরে যেতে পারে।"

করবী হেসে বলল, "ছোটখাট মানুষ হলে ধরে যাবে তোমায় ধরবে না।"

"আমি এমন কিছু বিরাট নই, ঠেলেঠুলে এর মধ্যে ঠিক এঁটে যাব।" এই বলে গীতা প্যাকিং বাক্সটার উপর বসল এবং সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়িয়ে উঠে বলল, "উফ্ পেরেক। ঠিক মত বসান হয়নি।"

মুঠোয় মৌরী রয়ে গেছে। করবী হাত বাড়িয়ে প্রফুল্লকে বলল, "খাবে?"

দু আঙুলে মৌরী নিয়ে প্রফুল্ল বাক্সটার উপর ঝুঁকে লক্ষ করতে করতে বলল, "তাই তো তিন চারটে পেরেক দেখছি বেরিয়ে রয়েছে! পথে খোঁচা লাগতে পারে, খুলে বেরিয়ে যেতেও পারে।"

"লোহটোহা কিছু নেই? বসিয়ে দেওয়া উচিত।" গীতা ঘরের এধার ওধার তাকাল লোহার খোঁজে।

"দেখি আছে কিনা!" প্রফুল্ল ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরের পিছন দিকে চলে গেল, এবং চেঁচিয়ে বলল, "টর্চটা আনোতো, কিছু দেখতে পাচ্ছিনা।"

"গীতা তোমার টর্চটা দিয়ে আসবে ভাই।" মৃদু শান্তস্বরে

করবী বলল, তারপর হাতের শেষ কয়েকটি মৌরী মুখে ছুঁড়ে দিল। গীতা বেরিয়ে যেতেই করবীর মুখ ধীরে ধীরে টসটসে হয়ে উঠল জ্বর-গ্রস্তের মত। দুহাতে কপাল চেপে সে মাথা নিচু করে বসে রইল।

মিনিট পাঁচেক পর পায়ের শব্দে করবী মুখ তুলল। কয়লা-ভাঙা হাতুড়ি হাতে প্রফুল্ল দাঁড়িয়ে। ওর জিজ্ঞাসু চাহনির জবাবে প্রফুল্ল বলল, "বাক্সটা একবার খুলতে হবে। থলিটা আনো বইগুলো তাতেই বরং ভরে নেওয়া যাবে।"